সুপ্রিয়ার বন্ধন

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নিউ-লিট পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯

কৈশোর থেকে

আজ অবধি

যাঁর সৃষ্টির প্রতি

আমার শ্রদ্ধা সমান

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের

অন্ধ নগর
এই মর্তভূমি
দূরের মিছিল
মুখর লণ্ডন
ইভনিং ইন প্যারিস
ব্যালেরিনা
দুর্গতোরণ
অন্তঃপুর
প্রদক্ষিণ
নীলকণ্ঠ
স্মরণ চিহ্ন
অন্দরমহল
সোহো স্কোয়ার
শ্রীমতী
পারাবার

: রচনাকাল :

অক্টোবর, ১৯৬০ থেকে জানুয়ারী, ১৯৬১

কলিকাতা

সেই এক জনকে অনেক ইচ্ছা যেন পাকে পাকে জড়ায়।

এক একটি ইচ্ছা—কখনও কখনও সুপ্রিয়ার মনে হয়—যেন এক-একটি ফুল। এলোমেলো হাওয়ায় দোলে। গন্ধ ছড়ায়। আর হঠাৎ কখন এক সময় ঝরে পড়ে।

কিম্বা—আরও মনে হয় সুপ্রিয়ার—তার ইচ্ছা প্রথম সন্ধ্যার অন্ধকারে ফুটে ওঠা তারার মতো। আলোর কণিকা বুকে নিয়ে সারা রাত মিটমিট করে আর ভোরের আলোর সাড়া জাগবার আগেই নিভে যায়—হারিয়ে যায়। আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

আর মাঝে মাঝে সুপ্রিয়ার মনের গোপন ইচ্ছা আক্রোশের প্রবল এক ঝাঁজে হিংস্র হয়ে যেন আশেপাশের মানুষগুলোকে সরীসৃপের মতোই ছোবল মারতে চায়। তার ইচ্ছা যেন ভয়ঙ্কর এক দাহ। তাকে পোড়ায়। যন্ত্রণা দেয়। হিংস্র করে তোলে।

কিন্তু কি মনে হয় সুপ্রিয়ার?

তার জীবনটাই যেন একটা অভ্যাস। তার স্বামী বিমল, সে নিজে আর গোটা সংসারটাই যেন অভ্যাসের পুরু এক দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর কিছু নেই কোথাও! বিমলের চোখে প্রশংসার অকম্পিত দৃষ্টি, উপভোগের থরোথরো আবেগ কিম্বা সুপ্রিয়াকে আয়ত্ত করবার আশ্চর্য অহঙ্কার—কিছু নেই।

ঝিমিয়ে-ঝিমিয়েই যেন ক্লান্ত সকাল আসে। ডোভার লেনে তেতলা বাড়ির এক ফ্ল্যাটে আলোর প্রথম রেখা উঁকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে যায় সুপ্রিয়ার।

মুখ ঘুরিয়ে সে একবার বিমলকে দেখে নেয়। ঘুমিয়ে আছে তার স্বামী। আর একটু পরেই উঠবে। প্রত্যেকটি অভ্যাস পালন করবে একে-একে। মুখ ধোবে। চা খাবে। খবরের কাগজ পড়বে। আর থেকে থেকে সময়টা মনে করিয়ে দেবে সুপ্রিয়াকে—অফিসের সময় হল।

সুপ্রিয়াও কাঠের পুতুলের মতো অভ্যাসের দড়িতেই দোল খাবে। চাকরকে বাজারে পাঠাবে। রান্নার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। ঠিক সময় টেবিলে খাবার সাজিয়ে বিমলকে ডাকবে, এস।

খেতে খেতে বিমল দেখবেও না সুপ্রিয়াকে। কতগুলো দরকারী কথা বলবে শুধু। বাড়িওলা এলে যেন ভাড়াটা দিয়ে দেয়া হয়। আজ অফিস থেকে ফিরতে তার একটু দেরি হবে। কিম্বা কাল দুজন বন্ধুকে খেতে বলেছে সেকথা জানিয়ে দেবে সুপ্রিয়াকে।

দুপুর গড়িয়ে যাবে একা-একা। সুপ্রিয়া হয় বই পড়বে নয় ঘুমবে। বাইরের পৃথিবীর আলো উত্তাপ আর গতির কোন খবরই সে পাবে না। কিন্তু মৃত্যুর ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ অনুভব করবে মনে মনে। এমন করে বাঁচতে তার ইচ্ছেও করবে না।

হ্যাঁ, সুপ্রিয়া মরে যাচ্ছে। কথাটা বাইরের কারুর কাছে স্বীকার করতে পারে না সে, কিন্তু আজকাল নিজেই মনে মনে বারবার বলে, আমি মরে যাচ্ছি, অভ্যাসের দড়ি থেমে থেমে গলার ফাঁস দৃঢ় করে আমাকে মারছে। আমি এ ফাঁস খুলে ফেলব। আমি মরতে চাই না—আমি বাঁচতে চাই।

কিন্তু কে তাকে বাঁচাতে পারে? তার স্বামী বিমল? আপনমনেই বলে ওঠে সুপ্রিয়া, না। তার স্বামী এখন অভ্যাসের সংসারে মূক ঠাণ্ডা পশুর মতো শুধু ঘোরে। আর তাকেও ঘোরায়। এই হিম-হিম গুহার অন্ধকার থেকে বিমল একা কোনদিনও তাকে প্রখর আলোর চঞ্চল জগতে নিয়ে যেতে পারবে, পারবে না—পারবে না।

আর একটা শিশু? সুপ্রিয়ার ছেলে কি মেয়ে! কিন্তু কেউ নেই। যদি তার রক্ত দিয়ে গড়া কেউ থাকত এ সংসারে—তছনছ করে ফেলত সব সাজানো জিনিস—ডোভার লেনের এই তেতলা ফ্ল্যাটকে সারাক্ষণ জাগিয়ে রাখত অক্লান্ত দাপাদাপিতে তাহলে হয়তো সুপ্রিয়ার বুকের ভয়ঙ্কর ইচ্ছেটাও—ঠাণ্ডা মিঠে নরম কড়া ইচ্ছেগুলোও দপদপ করে একে একে নিভে যেত।

আর তখন এই ঘুমিয়ে পড়া ঠাণ্ডা সংসারটাই ভাল লাগত সুপ্রিয়ার। বিমলকে মূক একটা পশুর মতো মনে হত না। আর হয় তো রূপের অহঙ্কার নিয়ে কাটা-কাটা একটা যন্ত্রণা সে অনুভব করত না মনে মনে।

কিন্তু কেউ আসবে না সুপ্রিয়ার সংসারের সব সাজানো জিনিস-গুলো তছনছ করে দিতে। আর একটা প্রাণ নিজের মধ্যে বহন করবার কোন উজ্জ্বল রেখা কোনদিনও ফুটে উঠবে না তার মুখে।

কার জন্যে তার এই অতৃপ্তি? কার জন্যে তার এই নিঃসঙ্গ একক জীবন? কার জন্যেই বা অভ্যাসের ফাঁস খুলে মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেয়ার একটা সাংঘাতিক আগ্রহ?

বিমল খুশি হয়েছিল প্রথম-প্রথম, ভালোই তো হল। সারা জীবন শুধু তুমি আর আমি—

না!—বাধা দিয়ে বলেছিল সুপ্রিয়া। আরও কি বলতে চেয়ে-

ছিল। কিন্তু বলতে পারেনি। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। দেহও। তার চোখের সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে সহ্য করতে পারছিল না।

কেউ কিছু বলতে পারেনা, সান্ত্বনার ভিজে-ভিজে স্বর বিমলের, এখনও অনেক সময় আছে—

সময় থাকতে পারে, বিমলের মুখের দিকে তাকায়নি সুপ্রিয়া, কিন্তু আমার কিছু হবে না।

কেন ?

অনেকক্ষণ স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি সুপ্রিয়া। তাকে আঘাত করার ইচ্ছেটাও দমন করে রেখেছিল। মনে মনে বলেছিল, আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠব না তোমাকে নিয়ে। আর তুমি আমাকে দিয়ে শুধু তোমার অভ্যাস পালন করবে।

সুপ্রিয়ার একেবারে কাছাকাছি এসেছিল বিমল, ডাক্তার দেখাবে একদিন ?

রূঢ় উত্তর দিয়েছিল সুপ্রিয়া, আমি ঠিকই আছি। তুমি ডাক্তার দেখাও।

হাসিমুখেই বলেছিল বিমল, আর ডাক্তার যদি বলে আমার জন্যেই তোমার কোনদিনও ছেলে মেয়ে হবেনা—কি করবে তখন ?

তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে সুপ্রিয়া বলেছিল, ডাক্তার ঠিক সেই কথাই বলবে।

বলনা কি করবে তখন ?

খুব আস্তে যেন ফিস ফিস করে উঠেছিল সুপ্রিয়া, কিছু না।

মুখে সেকথা বলেছিল বটে সেদিন। কিন্তু মনে মনে ? প্রচণ্ড তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বিমল দেখতে না পেলেও চোখে ফুটে উঠেছিল শরীর জ্বালানো বিতৃষ্ণা। গলার ফাঁসটা আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

হ্যাঁ, এ ফাঁস আমি ছিঁড়বই। পরিপূর্ণতার স্বাদ আমি পাবই। আমি বাঁচতে চাই। আমার রূপ যৌবন কারুর ভয়ে আমি নষ্ট করব না।

সুপ্রিয়ার দেহে কোন খুঁত খুঁজে পায়নি ডাক্তার। আর বিমলের দেহে পেয়েছে কি পায় নি সেকথা সে জানে না। যদিও হাসি-হাসি মুখ করে বিমল তাকে ধৈর্য ধরতে বলেছে তবুও সে বিশ্বাস করে না তার কথা।

হয়তো বিমলের অক্ষমতার কথাই জানিয়েছে ডাক্তার।

তাই সুপ্রিয়া এখন বুকজোড়া বিরক্তি নিয়েই সংসার করে। আর যেন দু হাতে সময়ের গতি আঁকড়ে নিজের বয়সটাকেও বাড়তে দিতে চায় না। সব কিছু ভাঙার একটা জেদ ফুলে ওঠে তার বুকে। সে নিজেকে ভাঙতে চায়। বিমলকে। এই গোটা সংসারটাকে। সব বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন চুরমার করে একটা সাংঘাতিক অভিশাপ আমন্ত্রণ করে আনতে চায়।

হ্যাঁ, একটা অভিশাপ। সাপের মতো তার দেহকে জড়িয়ে-জড়িয়ে নেমে আসুক। হিংস্র একটা ছোবল দিক। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাক তার দেহ।

তবু সে আসুক। অভিশাপই পরিপূর্ণ করে তুলুক তার জীবন। নিয়মের সংসার থেকে একটা প্রচণ্ড অনিয়ম তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাক অনেক দূরে। আর সুপ্রিয়া বেঁচে উঠুক।

হঠাৎ যেন তার চোখের সামনে নানা রূপ ধরে সেই গোপন অভিশাপটাই তাকে দিশাহারা করে তোলে। তার জীবনে বিমলই যেন একটা অভিশাপ। আজকের সব নিয়ম-কানুন আত্মীয়তা—বন্ধন—অভিশাপ ছাড়া আর কি।

তবে সুপ্রিয়ার আর কাকে ভয়! জীবনকে সে ভয় করেনা।

জীবনের দাবীকেও নয়। তাহলে? অভিশাপই তার জীবনকে রূপে রসে রঙে ভরে তুলবে।

কিন্তু কে বহন করে আনবে তার জীবনে মধুর সেই অভিশাপ? ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে সুপ্রিয়ার। চোখে তৃষ্ণা নিয়ে সে চারপাশে তাকায়।

না, এখন কেউ কোথাও নেই।

কিন্তু আসবেই কেউ না কেউ। যদি কেউ না-ই আসে তাহলে তার বুকের কান্নাটা হঠাৎ ফনা তুলে দেহমন চঞ্চল করে তোলে কেন! কেন আগুন লাগিয়ে দেয় তার শিরায়-শিরায়!

হঠাৎ নিজেকে সামলে নেয় সুপ্রিয়া। একা-একাই জানলায় দাঁড়িয়ে জ্বলে আর নেভে। তার কথা শোনবার জন্যে যেন একটি মানুষও নেই কোথাও।

না থাক। কাঁদবার ইচ্ছে নেই সুপ্রিয়ার। মনের গোপন সঙ্কোচটাও যেন জয় করে নেয় সে। কাউকে কোন কথা বলবার দরকার নেই। সে আর কারুর মতোই তো নয়। সে একা। একেবারে একা। আর আগুনের মতই তার দুঃসাহস।

তার কাকে ভয়! এ সংসারে তার জন্যে কিছু নেই। শুধু অভ্যাস আর অভ্যাস। আজ বিমল তার স্বামী আর সে বিমলের স্ত্রী।

কিন্তু কাল?

যদি সুপ্রিয়া মরে যায় তখন কি করবে বিমল? তার জন্যে শোক করবে নিশ্চয়ই প্রথম-প্রথম। প্রতিদিনের অভ্যাসে বিরাট এক ছন্দপতন হবে বলেই বিমর্ষ হয়ে এখানে-ওখানে ধাক্কা খাবে কিছুদিন।

তারপর বিমলের সংসারে সুপ্রিয়ার না থাকাটাই দিনে দিনে

একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। আর আরও পরে—যদি তখনও বিমলের বয়স থাকে—না থাকলেও ক্ষতি নেই—হয়তো আর একজন কেউ আসবে সুপ্রিয়ার জায়গায়।

আজ সে যেমন আছে এ সংসারে সেও থাকবে ঠিক তেমন। এমন করেই কাটাবে একটি একটি দিন। সুপ্রিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এ সংসার থেকে। কাজেই তার এখানে থাকা কিম্বা না থাকা যেন কিছুই নয়।

আর বিমল যদি হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে যায় তার জীবন থেকে? কয়েক মিনিট ইতস্তত করে সুপ্রিয়া। সকলের অলক্ষ্যে মনে মনে কি কথা ভাবতে গিয়েও যেন ভাবে না।

কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্যেই।

শোক করবে সুপ্রিয়া। নিয়ম তাকে মানতেই হবে। তার জন্যে না হোক, আর পাঁচজনের জন্যে। তারপর তার সেই শোক পরিণত হবে কঠোর অভ্যাসে—একটা ভান হয়ে দাঁড়াবে। আর তখনও ঠিক আজকের মতো তার মনে আগুন জ্বলে উঠবে। শোকের আগুন নয়—জীবনের আগুন। সুপ্রিয়া পুড়তে পুড়তে বাঁচতে চাইবে।

বাঁচবে কিনা কে জানে।

তাহলে এখন কি আছে তার জীবনে? স্বামী সংসার আর প্রেম?

অকারণেই সে একবার জোরে হেসে উঠতে চায়। বিমল এ সময় থাকলে সে হয়ত তার সামনেই হেসে উঠত। কিন্তু বিমল এখন নেই।

না, কিছু নেই সুপ্রিয়ার। সব আছে কিন্তু কিছু নেই। তাই সে যেন ডোভার লেনের এই তেতলা ফ্ল্যাটে থেকেও নেই।

একটা ক্ষুধা আছে শুধু চারপাশে। আকাশের মেঘে-মেঘে তারায়-তারায় গাছের পাতায় আলোয় ছায়ায় আর ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে সেই ক্ষুধার ছায়া পড়ে।

আর তখন হঠাৎ হিম হয়ে যায় সুপ্রিয়ার শরীর। সে যেন মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করে রোমকূপে। কিন্তু তা কতক্ষণের জন্যই বা!

একটু পরে আগুনের একটা আঁচ তাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জড়ায়।

॥ দুই ॥

বিকেলের ভিজে লালচে আলো আর একটু পরেই মাঠের ওপারে বাঁকা-বাঁকা ঝাউ-এর ফাঁকে-ফাঁকে রঙের শেষ স্পর্শ বুলিয়ে দপ্ করে নিভে যাবে আর তখনও ক্ষীণ একটা আভা কাঁপবে মোড়ের প্রথম বাড়িটার গায়ে।

সন্ধ্যে হতে না হতেই ফিরে আসবে বিমল।

এখনও আলো জ্বালা হয়নি ঘরের। আয়নার সামনে একটা চিরুনী হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুপ্রিয়া। প্রসাধন যেন কঠিন একটা কাজ। হাত চলেনা তার। পাউডারের কৌটোটাও হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতে কষ্ট হয়।

কোন উৎসাহ নেই নিজেকে সাজিয়ে তোলবার।

তবু হঠাৎ সুপ্রিয়ার টানা-টানা কালো চোখ দুটো হিংস্র হয়ে ওঠে। আর তখন ক্ষিপ্র হাতে সে টক করে আলোর সুইচ টেপে। হলুদ আভা ঝলসে ওঠে ঘরের মধ্যে। ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ ঠিক এই মুহূর্তে কানে যায় না সুপ্রিয়ার। সে তাকিয়ে থাকে আয়নার দিকেই।

যেন বিকৃত মস্তিষ্কের একটা মানুষ স্থির হয়ে আছে এক জায়গায়। জোরালো বালবের আলোয় নিজের চেহারাটা একবার ভাল করে দেখতে চায় সুপ্রিয়া। দেখেও। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে।

দেখতে দেখতে নিজেই তন্ময় হয়ে যায়। রূপের অহঙ্কার ফুলে ওঠে মনে। আর বিমলের কথা ভেবে চারপাশ যেন তেতো-তেতো হয়ে যায়।

হেমন্তের প্রথম। শীতের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পর্দা কাঁপিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। ধোঁয়াটে কুয়াশার ছায়া-ছায়া আমেজ আছে বাইরে। থরো থরো কম্পনের মতো দূরে ঝাউ-এর পাতা নড়ে। আর দেহটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সুপ্রিয়ার। বিমলের ঘর তাকে যেন একটু একটু করে পোড়ায়।

ঘরে থাকতে চায় না সুপ্রিয়া। যদিও বাইরে যাবার জন্যে চাপা উত্তেজনায় মাঝে মাঝে সে ছটফট করে আর নিজের এই আগুন-জ্বালা রূপের কথা আত্মতৃপ্তির রূঢ় সঙ্কেতে ঘোষণা করতে চায় দশজনের কাছে তবুও অতৃপ্তির একটা কঠিন আঁচড় যেন তার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেয়।

বাস ট্রাম জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহ, শহরের ছোট বড় রাস্তা, গাছ আর আকাশ—কেউ আর বিহ্বল হয় না তাকে দেখে। তেমন করে কেউ আর দেখেও না। শুধু অসংখ্য চঞ্চল চোখ পলকের সতর্ক দৃষ্টি দিয়েই যেন দমন করে নেয় তাকে দেখার ব্যাকুল এক ক্ষুধা।

সিঁথির মাঝে সিঁদুরের লাল বাঁকা রেখাটাই তাকে বেশ অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। সংকীর্ণ করে দিয়েছে তার জগৎ। আর তাকে দেখার যেন কোন অধিকার নেই।

মাত্র একজন মানুষই দেখবে তাকে। উপভোগ করবে দিনের পর দিন। পাওয়ার অহঙ্কারে আর কিছু চোখে পড়বে না তার। শুধু স্থূল একটা লালসা। মূর্তিমান লালসার মতই যেন বিমল তার কাছে আসে।

আসুক। তাতে ক্ষোভ নেই সুপ্রিয়ার। কিন্তু চোখ দুটোও

যেন নষ্ট হয়ে গেছে বিমলের। সে আর দেখতে জানে না সুপ্রিয়ার দেহসৌষ্ঠব। অধিকারের গর্বে শুধু তাকে উপভোগই করে।

আর রূপের সেই অপচয় সুপ্রিয়ার মনটাকে যেন গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়।

সমুদ্রের চঞ্চল একটা রুপোলি মাছকে যেন বালতির অল্প জলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চলতে ফিরতে মাথা ঠুকে যায়। অসহ্য যন্ত্রণা। এ জীবনের সব সাধ ঘুচে গেছে দু বছরেই। সুপ্রিয়ার বুকের ভেতর শুধু টন টন করে ওঠে।

কিন্তু দু বছর—মানে বিয়ের আগে সুপ্রিয়ার পৃথিবীটা যেন একেবারেই অন্য রকম ছিল। কৈশোর থেকেই প্রায় সে শুনত নিজের দেহের প্রশংসা, কী সুন্দর! বাবা, মা, ভাই, বোন সেই এক কথাই তাকে শোনাত বারবার—তার রূপের প্রশংসা।

তারপর যৌবন। অপরিচিত অসংখ্য চোখ তাকে দেখত নির্লজ্জের মতই। আর রাস্তায় বার হলেই ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট নানা ধরনের উক্তি শুনতে শুনতে বিব্রত বোধ করত সে।

কিন্তু যতই অস্বস্তি বোধ করুক সুপ্রিয়া—তখন সব কিছুর মধ্যে আনন্দের তীব্র একটা স্বাদ ছিল। যেন এক মুহূর্তেই সে তার রূপের জ্যোতি দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকে বশ করে নিতে পারে।

দেখুক তাকে অসংখ্য লোক। বিস্ময়ে মূক হয়ে যাক। আর অহঙ্কারে ভরে যাক সুপ্রিয়ার মন। রূপের জ্যোতি ছড়িয়ে-ছড়িয়ে সে ধাঁধা লাগিয়ে দিক অসংখ্য মানুষের মুগ্ধ চোখে।

কিন্তু আশ্চর্য, তার বিয়ের পরই যেন সমস্ত জগতটা স্তিমিত হয়ে এল। সেখানে সুপ্রিয়ার রূপ কোন আলোড়নই জাগায় না।

চোখের দৃষ্টি বুঝি ঝাপসা হয়ে গেল মানুষের। সিঁদুরের লাল বাঁকা রেখা তার জন্যে সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডি কেটে দিল।

প্রথম-প্রথম এই মারাত্মক ব্যবধান বুঝতে পারে নি সুপ্রিয়া। বোঝবার চেষ্টাও করেনি।

বিয়ে! এক জীবন থেকে মহত্তর আর এক জীবনে মন্থর মৃদু পদক্ষেপ। এবার সার্থক হয়ে উঠবে সুপ্রিয়ার সব কিছু—তার রূপ আর মন, দেহ আর যৌবন, কামনা আর জীবন। নিবিড় এক উন্মাদনা যেন আগুনের ছোঁয়া লাগায় তার চৈতন্যে।

কিন্তু হঠাৎ কখন একদিন সে আগুন নিভে যায় সুপ্রিয়া বুঝতে পারে না। এখন তার শরীর আর মন ঘিরে শুধু ফুটে উঠেছে বিরক্তির কয়েকটা পুরু রেখা। আর সারা দিন রাতের ঘন ক্লান্তি আচ্ছন্ন করে রাখে তার মেজাজ। সুপ্রিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু কি তার যন্ত্রণা? এক আগুন নিভে আর কোন আগুনের দাহ বিশৃঙ্খল ভাবনা ভাবিয়ে তাকে দিশাহারা করে তোলে?

তার স্বামী। এই সংসার। নিয়মের রাশ টানা নিরানন্দ জীবন। আর থেকে থেকে মনে হয় যেন প্রতিদিনের কঠোর উপবাস তাকে তিল তিল করে মারছে। শান্তি আছে। সুখ নেই। একটি-একটি করে আসে ম্লান দিন আর বিষাক্ত মুহূর্ত। কখনও কখনও কান্নার বিপুল তরঙ্গ বুক তোলপাড় করে সুপ্রিয়ার। রূপের জগৎ থেকে—দম্ভের পরিধি থেকে যেন তার নির্বাসন।

হ্যাঁ, বয়সটা যেন বড় তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে সুপ্রিয়ার। সংসার আর কর্তব্যের বোঝা বয়ে-বয়ে সে শুধু বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। এমন করে বেঁচে থাকবার কি মানে হয়।

কখনও কখনও সুপ্রিয়ার নিভে যাওয়া মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিমল। আস্তে আস্তে তার কাছে সরে আসে। গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে।

আর তখন অকারণেই উষ্মা প্রকাশ পায় সুপ্রিয়ার গলার স্বরে। একটু দূরে সরে গিয়ে সে যেন বিমলের ছোঁয়া বাঁচায়। তার জন্যেই যেন সুপ্রিয়ার এই নির্বাসন।

ঝাঁজের একটা ঝলক বেরিয়ে আসে তার গলা চিরে, কি ?

শরীর ভাল নেই তোমার ?

খুব ভাল আছে।

তাহলে ?

কি ?

এমন মুখ কেন ? এমন করে কি তুমি ভাব আজকাল সারাদিন ধরে ?

সুপ্রিয়ার ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে সত্যি কথা বিমলকে বলে দিয়ে তার সংসার আর ভিজে-ভিজে দিনগুলি দুই পায়ে মাড়িয়ে একা-একা কোথাও চলে যেতে। আর কেউ আসুক তার কাছে। তার দেহে সঞ্চারিত করে দিক আর একটা প্রাণ। সার্থক হোক সুপ্রিয়ার রূপ আর জীবন। নিজের মধ্যে আর একটা প্রাণের দাপাদাপিতে সে আবার নতুন করে বেঁচে উঠুক।

কিন্তু সুপ্রিয়া কথা বলতে পারে না। আপন মনে সংগ্রাম করে সে যেন নিজেকে সংযত করে। সঙ্কোচের একটা ঠাণ্ডা স্পর্শও যেন লাগে তার মনে। কোন ভাষায় সে নিজের সব কথা খুলে বলবে বিমলকে !

সুপ্রিয়া মুখ ফিরিয়ে শুধু বলে, আমার কিছু হয় নি—তারপর সরে যায় সেখান থেকে।

সে যেন অনেকক্ষণের জন্যে বিমলের কাছ থেকে সরে থাকতে চায়। কেন, কেন বিমল একাই শুধু দেখবে তাকে? কেন এগিয়ে আসবে তার কাছে? এই রূপ, এই দেহ, এই মন কেন, কেন মাত্র একটি অধিকারপ্রমত্ত লোকের জন্যে অপচয় করবে সুপ্রিয়া!

শীত-শীত প্রথম অন্ধকারের নির্জনতায় তার মাথায় যেন আগুন ধরে যায়। অন্য আর এক আগুন। জ্বলুক। তাকে জ্বালাক। আগুনের আশ্চর্য আভায় আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া নিজেকে দেখতে চায়.

তবু যদি তার রূপের কোন মূল্য দিত বিমল! সাতদিনের মধ্যে অন্তত একদিন—এক মুহূর্তের জন্যেও তার দিকে তাকিয়ে থাকত মুগ্ধ হয়ে। যদি একবারও অস্পষ্ট গুঞ্জন করে উঠত তার কানের কাছে মুখ এনে, তুমি অপূর্ব!

না, তেমন কোন বিশেষণ আজকাল বার হয় না তার স্বামীর মুখ দিয়ে।

আর যদি হঠাৎ একসময় ভুল করেও তেমন কথা বলে ফেলে বিমল তাহলে কি প্রতিক্রিয়া হবে সুপ্রিয়ার মনে তা সে নিজেই জানে না।

যদিও প্রথম-প্রথম উন্মাদনার থরো থরো জোয়ারে এই বিমলই তার কাছে অন্য আর এক মানুষ হয়ে উঠেছিল। তখন বিমল কথা বলত আর সুপ্রিয়া শুনত। শুনতে শুনতে কাঁপত। আশ্চর্য এক আভায় জ্বলত। আর জ্বলতে জ্বলতে যেন শেষ হয়ে যেত—মিলিয়ে যেত বিমলের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। বিয়ের পর-পর।

কারণ বিয়ের আগে এমন দুঃসাহসীর মতো এত স্পষ্ট করে এত কাছে থেকে আর কেউ কামনা করে নি তাকে। কেউ শরীরের

সমস্ত শক্তি দিয়ে উন্মাদের মত দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে এক হয়ে যায় নি তার সঙ্গে। আর তার সঙ্গ পাবার আশায় এমন ব্যাকুলও হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু আজ!

শুধু সুপ্রিয়ার নিজের কথা নয়, বিমলের উন্মাদনার জোয়ারও যেন ক্লান্তির অদ্ভুত ভাটায় একেবারে থিতিয়ে গেছে।

যায় যাক। ওর কি আছে না আছে সে কথা ভেবে বিচলিত হয় না সুপ্রিয়া।

সে শুধু নিজেকেই দেখে—নিজেকেই খোঁজে। আর মনে হয় এই নেভা-নেভা জীবনে সে শেষদিন অবধি মানিয়ে থাকতে পারবে না। শুধু অন্য আর একজনের সম্পত্তির মত ঘরের এক কোণে বসে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবার জন্যে তার এ রূপ নয়।

কিন্তু এসব কথা আজও স্পষ্ট রূঢ় ভাষায় কেন সে বিমলকে বলতে পারে না! কি সে চায় আর কেমন করে কাটাতে চায় প্রত্যেকদিন—সে কথাটা বিমলকে জানিয়ে দিলে বোধহয় তার অস্বাভাবিক যন্ত্রণা অনেক কমে যায়।

না, জানানো যায় না।

মনের কথা সহজ করে বলতে গেলেই আশে-পাশের মানুষের সঙ্গে এক হয়ে দপ করে জ্বলে উঠবে বিমল। আর সম্ভব হলে সুপ্রিয়াকে দেবে নির্বাসন।

যেন ভদ্র লোকালয়ে তার জন্যে কোন স্থান নেই। এমন ভয়ঙ্কর একটা জীবনকে পাঁচজনের মধ্যে রাখা মানেই সাংঘাতিক এক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া। আর প্রচণ্ড শব্দ করে হয়তো একে-একে সব দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে সুপ্রিয়ার জন্যে।

কিন্তু তাহলে কি এসে যাবে তার। এখন তার জন্যে সকলের

সব দরজা খোলা থাকলেই বা কি লাভ। শুধু যেন নিজেকে কৃত্রিম এক বন্ধনে বেঁধে রাখা—বন্দী করে রাখা।

এতক্ষণ পর বিমলের কথা ভেবে হাসির হালকা একটা রেখা ফুটে ওঠে সুপ্রিয়ার মুখে। একদিন সোজাসুজি সে যদি তাকে তার মনের এই অবস্থার কথা অল্প-অল্প করে জানিয়ে দেয় তাহলে কি ভাবান্তর হবে আজকের এই আশ্চর্য রকম ভদ্র মানুষটির?

মনে মনে দৃশ্যটা একবার কল্পনা করবার চেষ্টা করে সুপ্রিয়া।

আর একবার দিনের ক্লান্তি যখন গাঢ় একটা ছায়া ফেলবে সুপ্রিয়ার দেহে আর তার চোখে-মুখে নামবে অবসাদের রেখা তখন যদি বিমল তাকে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

আর সুপ্রিয়া যদি উত্তর দেয়, তোমাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

কেন?

তোমার যোগ্যতা নেই। তুমি আমার সাধ পূর্ণ করতে পার নি।

কি তোমার সাধ?

জান না? আমাকে দিনের পর দিন ভোগ করে তুমি তৃপ্ত হবে কিন্তু আমি?

তখন কি উত্তর দেবে বিমল? কি প্রতিক্রিয়া হবে তার মনে? আর সুপ্রিয়ার অল্প কয়েকটি কথার জ্বালায় কি অবস্থা হবে তার?

প্রথমে বিমল হয়ত বিশ্বাস করবে না সুপ্রিয়ার কথা। তার এমন আকস্মিক উত্তেজনার কোন কারণই হয়ত খুঁজে পাবে না। হাসবে। কিংবা হালকা বিদ্রূপ মনে করে রসিকতা করবে তার সঙ্গে।

আর তখনই ঝাঁজ ফুটে উঠবে সুপ্রিয়ার স্বরে। তিন পা পিছিয়ে

গিয়ে সে সত্যি বলবে, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার সংসারে এমন করে পুড়ে-পুড়ে আমি নিভে যেতে পারব না—

সন্দেহের কঠিন দৃষ্টি ঠিক সেই মুহূর্তে নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে বিমলের চোখে, তুমি কি চাও ?

আমিও তৃপ্ত হতে চাই।

এখনও সময় আছে সুপ্রিয়া।

না নেই। মনগড়া মিথ্যায় কেন তুমি আমাকে শুধু নিজের স্বার্থের জন্যে ভুলিয়ে রাখতে চাও ?

না, তখনও জেদ বজায় রাখার বৃথা চেষ্টায় দৃঢ়স্বরে বলবে বিমল, আমি তোমাকে ভুলিয়ে রাখি না।

হঠাৎ সাপেব মত ফনা মেলে সুপ্রিয়া বলে উঠবে, কিন্তু আমি আমার এই রূপের দাম পেতে চাই।

আমি কি দিই না ?

তোমার দেওয়ায় আমার মন ভরে না।

আর কি তুমি চাও ?

একশোবার বলেছি।

দু-এক মিনিট হয়ত চুপ করে থাকবে বিমল। লজ্জার দাহে মনে মনে বোধহয় হাঁসফাঁস করবে। কিন্তু সুপ্রিয়া জানে যে সে তখনও তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। আর পাঁচজন পুরুষের মতই হার স্বীকার করতে চাইবে না কিছুতেই।

যে-বিষয়ে আমার কোন হাত নেই তা নিয়ে কেন তুমি আমাকে বারবার আক্রমণ কর ?

কারণ আমার হাত আছে।

তার মানে ?

প্রশ্ন শুনে নিজেকে সামলে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে

সুপ্রিয়া। একটু ইতস্তত করবে। বলবে কি না বলবে সেকথা ভাববে।

তারপর যেন কোন কীটের বিষাক্ত দংশনে অধীর হয়ে বলে ফেলবে, বাঁধাধরা জীবনের মধ্যে আমি থাকতে চাই না। একটা অক্ষম মানুষকে নিয়ে আমি সারা জীবন খুশি থাকতে পারি না—

কথাটা হয়ত শেষ করতে পারবে না সুপ্রিয়া। এবার ভীষণ জোরে বিদ্রূপের হাসি হাসবে বিমল। আর তার ছোঁয়া বাঁচাতে অনেকটা দূরে সরে যাবে। তারপর বাঁকা কথার চোখা-চোখা তীর ছুঁড়ে মারবে একটি-একটি করে।

দশটা মানুষকে নিয়েই যদি থাকতে চাও, তাহলে সে-কথাটা ঠিক সময় তোমার বাবাকে জানাতে পারনি কেন? এত ঘটা করে আমাকে তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবার কি দরকার ছিল?

আগের কথা ভেবে লাভ নেই, একটুও দমবে না সুপ্রিয়া। বিমলের মুখের দিকে তাকিয়েই বলে যাবে, তোমার অক্ষমতার কথা কে জানত তখন?

সুপ্রিয়া! যুক্তির কোন সূত্র খুঁজে না পেয়ে ধমক দিয়ে উঠবে বিমল, শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবলেই জীবন সার্থক হয় না।

ওসব বাঁধাধরা বুলি শুনিয়ে তুমি আর আমাকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা কর না। যেমন করে আমি থাকতে চাই না, তুমিই বা কেন তেমন করে আমাকে রাখতে চাও?

কারণ তোমার খেয়ালে বাধা দেবার একটা আইনগত অধিকার আমার আছে।

আমারও আছে।

না, নেই। তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে আমি লোকের কাছে ছোট হতে পারি না।

কিন্তু তুমি অনেকদিন আগেই আমার কাছে ছোট হয়ে গেছ। ভুলে যেও না যে, আইনের সাহায্য নিলে এক কথায় আমিও তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি।

আইনের ওপরে আর কিছু নেই? এবার হঠাৎ যেন ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বিমলের গলার স্বর।

কিন্তু তখনও সুপ্রিয়ার সতেজ ভাষা বেজে উঠবে, তুমি আমার দিক দেখছ যে আমি তোমার দিক দেখব?

অধৈর্য হয়ে বিমল বলবে, মিথ্যা কথা বলে নিজেকে শুধু শুধু ছোট কর না—

আমার মন নিয়ে আজকাল এক মুহূর্তের জন্যেও তুমি কোন ভাবনা কর না।

সুপ্রিয়া! দরদের লেশমাত্র থাকবে না বিমলের ডাকে।

আর উত্তাপের ফুলকি ছুঁড়ে ছুঁড়ে জ্বলন্ত সুপ্রিয়া বলে যাবে, তুমি একাই শুধু নিজের খেয়াল মেটাতে পার, আর জীবনের সব চেয়ে বড় ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারি না?

এক দৃঢ় উত্তর, না।

তোমার চেয়ে আমার জীবন আরও অনেক বড়। তোমার সংসারে আমি কেঁচো হয়ে শুধু অন্ধকারে টিকে ছিলাম। কিন্তু আর নয়—

কি করবে এখন তাহলে?

নিজেকে বাঁচাব।

ব্যস্, এতেই বোধহয় যথেষ্ট হবে। আর বেশি কথা বলবার দরকার নেই। আর কিছু বলতে পারবেও না সুপ্রিয়া। যা বলবার বিমলই বলে যাবে। তারপর যা করবার করে যাবে।

কি কি করবে বিমল তার একটা স্পষ্ট ছবিও চোখের সামনে

সুপ্রিয়া দেখতে পায়। হঠাৎ তার ওপর বিমলের কৌতূহল সীমা ছাড়িয়ে যাবে। চলতে ফিরতে অসংখ্য প্রশ্ন করবে তাকে।

কেউ এসেছিল কি না? সে কি আজ বেরিয়েছিল কোন সময়? বিমল নিজেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইবে এখানে-ওখানে। আর তার পাশে পাশে ফিরবে ছায়ার মত। তাকে সন্দেহ করবে কথায়-কথায়। ভাবতে ভাবতে ঠোঁট টিপে হাসে সুপ্রিয়া।

হয়তো কোন-কোন দিন সুপ্রিয়ার ওপর সন্দেহ আরও কুৎসিত করে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে একটা ছুতো করে অনেক আগেই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসবে বিমল।

আর তাকে দেখে হঠাৎ অবাক হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক সুপ্রিয়ার পক্ষে। কিন্তু তার বিস্ময়ের একটা মনগড়া অর্থ করে ঠাণ্ডা দুপুরকে জ্বালিয়ে দেবে বিমল আর আরও কঠিন করে তুলবে সুপ্রিয়ার মন।

এখুনি ফিরলে যে? অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে প্রশ্ন করবে সুপ্রিয়া।

না ফিরলেই খুশি হতে বুঝি? সাপের মতোই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করবে বিমল।

বেশ জোরেই বলে ফেলবে সুপ্রিয়া, হ্যাঁ হতাম। সে কথা যখন বুঝতে পার তখন কেন বাড়ি ফিরে এলে তাড়াতাড়ি?

বিমলও তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলবে, তুমি আমাকে যে আমার বাড়িতে বসে বোকা বানাতে পারবে না সে কথা প্রমাণ করবার জন্যে—দূরে সরে যেতে যেতে বিমলকে বাধা দিয়ে ঠাণ্ডা স্বরে সুপ্রিয়া বলবে, বোকা আমি তোমাকে বানাই নি। কে কাকে বোকা বানিয়েছে তা কি আজ আবার নতুন করে তোমাকে বলবার দরকার আছে?

হ্যাঁ আছে।

নিজে বুঝতে পার না ?

তা বলে তুমি আমাকে নিয়ে খেলা করবে ?

যেন কেঁদে উঠবে সুপ্রিয়া, না না। তোমাকে নিয়ে খেলা করবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

চোখ দুটো প্রথমে হিংস্র হয়ে উঠবে বিমলের। ধক ধক করবে। কিন্তু তার স্বভাব জানে সুপ্রিয়া। সে কাছে এগিয়ে এসে তার গলা টিপে ধরে মেরে ফেলবার কোন চেষ্টা করবে না।

দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রাগে ছটফট করবে। তারপর একেবারে জুড়িয়ে যাবে আস্তে আস্তে। এক-পা এক-পা করে হঠাৎ এক সময় গড়িয়ে পড়বে খাটের ওপর। যেন শরীরে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে তার। আর সুপ্রিয়া এসে মাথার কাছে বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বিমলের কাছাকাছি আসবে না সুপ্রিয়া। অমন মানুষের মুখ দেখবার ইচ্ছেই হবে না তার তখন। একা-একা অন্য আর একটা ঘরে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়ার শরীরটা বোধহয় হিম হয়ে যাবে।

তার নাম ধরে জোরে ডেকে উঠবে বিমল। এক বার। দু বার। তিন বার। ঝাঁজালো ডাক নয়। কাঁপা-কাঁপা। করুণ। যেন গলার স্বরেই রোগের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করে বিমল।

পুতুলের মতো এ ঘরে আসবে সুপ্রিয়া। বিমলের মুখের দিকে না তাকিয়ে চাপা স্বরে বলবে, কি ?

আমাকে দেখে তুমি খুশি হও নি ?

ঝগড়া-তর্কের ক্লান্তি এক কথায় ঘুচিয়ে দেবার জন্যে এবার সুপ্রিয়া বলবে, হয়েছি।

আর তখুনি খাটের ওপর উঠে বসবে বিমল। নেমে পড়বে। সুপ্রিয়াকে আদর করে বলবে, চল কোথাও ঘুরে আসি? একটা ছবি দেখতে যাবে? কতদিন যে আমরা এক সঙ্গে বেড়াতে বার হইনি—

তখন কি মনে হবে তার? স্বামীর এই অকারণ উৎসাহে সে কি জ্বলে উঠবে না? বিমলকে তার কি মনে হবে না একটা অতিকায় সরীসৃপের মত—যে শুধু তাকে সারাজীবন ঠাণ্ডা বাঁধনে বেঁধে রাখতে চায়?

হ্যাঁ, মনের এই কথাগুলোই সুপ্রিয়া একদিন জানিয়ে দেবে বিমলকে। সম্ভব হলে আজই রূঢ় একটা আঘাত লাগুক তার বুকে। সে ভেঙে পড়ুক কিম্বা জ্বলে উঠুক। কিছু যাবে আসবে না সুপ্রিয়ার।

কিন্তু যে-বন্ধন তাকে সারা দিন-রাত যন্ত্রণা দেয়—তাকে দিনের পর দিন ম্লান সংসারে মূক পশুর মত ঘোরায়, সে-বন্ধনে এক তিল আস্থা নেই সুপ্রিয়ার।

বাইরে অন্ধকার থমথম করে। সামনের সাদা বাড়িটা সুপ্রিয়ার চোখের সামনে যেন ঝিমোয়। অল্প-অল্প হাওয়া দিয়েছে এখন। তবুও শীত লাগে না সুপ্রিয়ার।

সে এদিক-ওদিক তাকায়। কেউ কোথাও নেই। বিপুল এক উত্তাপে দেহ জ্বলতে থাকে সুপ্রিয়ার। রক্তে কিসের একটা নেশা লাগে।

সে কেমন করে বাঁচবে!

॥ তিন ॥

কিন্তু কঠিন সোপান পেরিয়ে সুপ্রিয়া পৌঁছে গেছে তৃপ্তির উচ্চতম শিখরে। হয়তো সে-ই বলে পেরেছে। অন্য কেউ হলে ইতস্তত করত—পিছিয়ে আসত। সুপ্রিয়ার মত দুঃসাহসী হয়ে আর একটা সতেজ প্রাণকে আমন্ত্রণ করে আনতে পারত না নিজের বুকের মধ্যে।

দক্ষিণের ঘরে সকাল থেকেই শীতের কচি রোদ্দুর ঝলমল করে। এ বাড়িটার ওপর সুপ্রিয়ার একটা মায়া পড়ে গেছে। কাছাকাছি কম ভাড়ায় আর একটা ফ্ল্যাট কিছুদিন আগে পাওয়া গেলেও সে উঠে যেতে রাজি হয়নি। অন্য বাড়ি কেমন হবে কে জানে।

এ বাড়ি ছাড়তে ভয় লাগে সুপ্রিয়ার। এ বাড়ি তাকে ঢেকে রাখবে—লুকিয়ে রাখবে। এমন আশ্চর্য শান্তি—শান্তি না ভয়—ভয় না অশান্তি যদিও ঠিক বুঝতে পারে না সে তবুও এখান থেকে উঠে যেতে তার সাহস হয় না।

যেন প্রত্যেকটি লোক তাকে বিদ্রূপ করবে। ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে। অচেনা নতুন জায়গার চেয়ে যেন এই পুরনো পরিবেশ অনেক ভাল। এখানেই বেঁচে থাকতে চায় সুপ্রিয়া—এখানেই বাঁচিয়ে রাখতে চায় আর একটা নতুন প্রাণকে।

হ্যাঁ, তার ছেলে।

ছোট খাটটার দিকে একবার সে তাকিয়ে দেখে। ঘুমোচ্ছে। কে ও? তার বুকের মধ্যে বেড়ে ওঠা কয়েক মাসের ছোট্ট একটা মানুষ।

ওর কি নাম দেবে সুপ্রিয়া?

কিন্তু সেদিন বিমলের দৃষ্টিতে কি ছিল? ঘৃণা না অবিশ্বাস? না সুপ্রিয়াকে শাস্তি দেবার কঠিন এক শপথ? কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল সুপ্রিয়া। সব সাহস উধাও হয়ে গিয়েছিল তার মন থেকে। আর একটু হলে তার ব্যবহারেই সে বুঝি ধরা পড়ে যেত বিমলের কাছে।

হয়তো এতদিনে সবই বুঝতে পেরেছে বিমল। কিন্তু আশ্চর্য, রাগের একটা রেখাও নেই তার কপালে। একটা কঠিন কথাও সে শোনায় নি সুপ্রিয়াকে। তবে কিছুই কি জানে না বিমল?

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে আর একবার ছেলেটাকে দেখে সুপ্রিয়া। তারপর একবার চারপাশে তাকিয়ে নেয়। এখন কেউ কোথাও নেই। ঝি-চাকর—কেউ না। বিমল গেছে অফিসে।

ফিরে এসে প্রথমেই সে ঝুঁকে পড়বে ছোট্ট মানুষটার খাটের ওপর। হাসবে। হাততালি দেবে। আর ছেলেটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। পারলে হয়তো কথা বলত। লাফিয়ে উঠত বিমলের কোলে।

কিন্তু তখন—বিমল যখন খোকনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে—সুপ্রিয়ার বুকটা কেন কনকন করে ওঠে! তাড়াতাড়ি সে এসে দাঁড়ায় অন্ধকার বারান্দায়। আকাশের দিকে তাকায়। আর লজ্জার একটা ভারী বোঝা যেন তার দেহ বেঁকিয়ে দেয়।

যে ভয়ঙ্কর আগুন তিল তিল করে পোড়াত সুপ্রিয়াকে, এখন তার লেশমাত্র নেই। খোকন আসবার সঙ্গে সঙ্গে সব জুড়িয়ে

গেছে—সুপ্রিয়া নিজেও। আশ্চর্য, এত লজ্জা আর ভয় তার মনের মধ্যে ছিল, সেকথা কে জানত!

প্রথম দিন—খোকন আসবার আগে আগে অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বুকের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছিল সুপ্রিয়াকে। নিখুঁত অভিনয় করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছিল।

যদিও ঠিক সেই মুহূর্তে কোন মেয়েই হাসে না তবুও মুখে একটু বেশি হাসি ফুটিয়ে ছেলেমানুষের মত কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী করে বিমলকে খবরটা দিয়েছিল সুপ্রিয়া। তারপর গোপন উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে বিমলের মুখে কোন রেখা পড়ে কি না-পড়ে, তা লক্ষ্য করবার জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল তার ওপর।

চমক আর বিস্ময়-মেশানো অদ্ভুত একটা স্বর যেন বেরিয়েছিল বিমলের গলা চিরে, সে কী!

থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সুপ্রিয়া। নিজেকে সামলে নেবার সাংঘাতিক চেষ্টায় বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলেছিল, হ্যাঁ, ডাক্তারদেরও ভুল হয়—

কিন্তু কেমন কাঠ-কাঠ স্বর বিমলের, তোমারও ভুল হতে পারে সুপ্রিয়া।

না।

কেমন করে বুঝলে?

বুঝেছি।

কিন্তু অত জোর দিয়ে কথাটা সেদিন বিমলকে বিশ্বাস করাবার কি-ই বা দরকার ছিল! ওর ঠোঁটের ফাঁকে কড়া হাসির ঝিলিক ছিল কি সুপ্রিয়াকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই—সে যে তার কথা বিশ্বাস করছে না তা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই!

কিন্তু বিমলকে অত ভয়ই বা কেন করবে সুপ্রিয়া? সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। একটা সাংঘাতিক নিয়ম ভেঙে নিজেকে নতুন করে নিজের কাছে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে বলে তার তো গর্ব করবার কথা। ছোট তুচ্ছ ভাবনা ভেবে এখন দিনগুলো ভারী করে তোলবার দরকার কি।

বিমল যদি তাকে সন্দেহ করে নিজের থেকেই আসল কথা বুঝে নেয়—নিক। তাহলে তো ভালই হয়। সুপ্রিয়া কেন শুধু শুধু ভেবে মরবে।

না, কোন সন্দেহর প্রকাশ আর নেই বিমলের চোখে। মুখে একটাও প্রশ্ন নেই। অবহেলা নেই। অশ্রদ্ধাও নেই।

আশ্চর্য!

হয়তো তার দিক থেকে কিছু নেই বলেই সুপ্রিয়া আপন মনে একা-একা জ্বলে-জ্বলে মরে। যদি বিমল খোকনের জন্ম-রহস্য নিয়ে কথায়-কথায় আঘাত করত সুপ্রিয়াকে—অপমান করত—তাহলে হয়তো একটা নিঃসঙ্গ জগতে তাকে এমন করে ছটফট করে কাটাতে হত না দিনের পর দিন।

সব ভেঙে চুরে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সে বেরিয়ে যেতে পারত যেখানে খুশি। একটা নিয়ম যখন ভাঙতে পেরেছে, তখন দশটা নিয়ম ভাঙতে পারত। আর মনে মনে বিমলকে ছোট ভাবতে পারলে হয়তো এক কথায় সে রথীনকে বিয়েও করতে পারত। খোকন জন্ম থেকেই চিনত তার বাপকে।

কিন্তু—নিশ্বাস ফেলে আর একবার ভাবে সুপ্রিয়া, আশ্চর্য মানুষ তার স্বামী বিমল। সে সব মেনে নিয়েছে—সব বুঝেও কিছু না-বোঝার ভান করে চলেছে। যেন খোকন তারও নিজের ছেলে।

তার ভাবনায় ঘুম নেই বিমলের।

কিন্তু খোকন আসবার আগে-আগে সুপ্রিয়াকে নিয়েই বা অত ব্যস্ত হত কেন বিমল? ঠিক দিনে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, ওষুধের দোকানে দশবার ছুটোছুটি করা, আর তার স্বাস্থ্যের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা—কেমন মানুষ বিমল!

তবুও প্রথম প্রথম তাকে অবহেলাই করেছে সুপ্রিয়া। মেরুদণ্ড-হীন ভীতু একটা মানুষ। লোকলজ্জার জন্যে ইচ্ছে করেই বোবা সেজে আছে। একটাও কথা বলে না। সব মেনে নিয়ে অসহায়ের মত মুখ বুজে থাকে।

যেন এই দেখাশোনা—খোকনকে নিয়ে মাতামাতি করা এই সংসারেরই একটা বাঁধাধরা অভ্যাস। আর অভ্যাসের ক্রীড়নক হয়ে বিমল বোধ হয় সব আলোড়ন মনে মনে এড়িয়ে যায়।

আর একজন—রথীন যার নাম—যে একদিন সুপ্রিয়ার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা দেখে তাকে শুধু ভীতুর মত মনে মনেই প্রশংসা করেনি কিম্বা দূর থেকে পলকের দেখা দেখে সরে যায়নি। মিলিয়ে যায়নি অন্ধকারে। তার জ্বালার ভাগ নিয়েছে—যন্ত্রণার কথা বুঝেছে—তার বুকের তৃষ্ণার কথা ভেবে দুর্নামের ভয় না করে সমবেদনা নিয়ে কাছে এগিয়ে এসেছে।

এ সংসারে কোন অভ্যাসের দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখবে সুপ্রিয়া!

কিন্তু যা হোক, সে-ভাবনা তার নয়। যদি রথীন মাঝে মাঝে আসে এ-বাড়িতে আর তার ছেলেকে দেখে আর বিমল যদি হেসে কথা বলে তার সঙ্গে—তাতে কার কি!

এত অল্পেই রথীন যদি খুশি থাকে—থাক। হয়তো এখন সুপ্রিয়াকে তার আর কোন দরকার নেই। সুপ্রিয়ারও বোধ হয় সব

প্রয়োজন ফুরিয়েছে রথীনের সঙ্গে।

কিন্তু প্রথম প্রথম সে-সাহস ছিল রথীনের। নিয়ম ভাঙার বিরাট এক মানুষ। মনের দাবির চেয়ে বড় যার কাছে কোন সংস্কারই নয়—আজ কেন সে পা টিপে টিপে চোরের মত এ-বাড়িতে আসে তার নিজের ছেলেকে দেখতে।

শীতের ফ্যাকাশে দুপুরের হাওয়ায় একটা অদ্ভুত কনকনানি ছিল আর সাপের গায়ের মত পিছিল একটা স্পর্শ। ভয়ে ভয়ে খোকনের দিকে তাকায় রথীন। যেন ওর গায়ে হাত দিতে সাহস হয় না। চমকে চমকে ওঠে।

বিবর্ণ ঠোঁট সুপ্রিয়ার। কঠিন গ্লানির একটা বোঝা যেন তার মুখটা জোর করেই নামিয়ে দেয়। তবু সে জ্বলে উঠতে চায়।

আর একবার পুড়িয়ে মারতে চায় রথীনকে। রূপের কিম্বা বুক নিঙড়ানো কামনার আগুনে নয়। অন্য আর এক আগুনে—এক ভয়ঙ্কর সত্য ঘোষণা করবার ক্ষিপ্ত ইচ্ছায়। পুরনো সুপ্রিয়াকে সারা মন হাতড়ে অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যেও সে নিজেই যেন খুঁজে বার করতে চায়।

কেন সুপ্রিয়া চুপ করে থাকবে? কেন রথীন পালিয়ে বেড়াবে? কেন খোকন তার আসল বাপের কথা জানতে পারবে না?

সুপ্রিয়া কথা বলে রথীনের সঙ্গে, যখন কেউ থাকে না তখন কেন তুমি ভয়ে ভয়ে এ-বাড়িতে আস?

হঠাৎ সুপ্রিয়ার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না রথীন। বোকা-বোকা চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। গরম কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে একবার বুলিয়ে নেয়।

সুপ্রিয়া আবার বলে, ও যখন থাকে, তখন তোমার আসবার সাহস হয় না কেন ?

সুপ্রিয়া কি বলতে চায় রথীন বুঝতে পারে না। সে কি তাকে আক্রমণ করে কথা বলছে ? সে কি এতদিন পরে তাকে লম্পট মনে করে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে ? রথীন মনে মনে ভাবে, হয়তো তাই। এখন তাকে সহ্য করতে পারে না সুপ্রিয়া।

আস্তে আস্তে রথীন বলে, আমি বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসি না সুপ্রিয়া।

যার সঙ্গেই দেখা করতে আস, দুই হাতে রথীনের বিশাল দেহটা ঝাঁকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সুপ্রিয়ার, ওর সামনে এলে ক্ষতি কি ?

নিজের কোন ক্ষতি না। কিন্তু তোমার যদি—

বাধা দিয়ে সুপ্রিয়া বলে, আমার ভাবনা ভেবে তুমি চোর সেজে থাকবে নাকি ?

উপায় কি ?

খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে সুপ্রিয়া, আগে তুমি তো এমন ছিলে না।

অল্প অল্প হাসে রথীন। খোকনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই মানুষটিও তো আগে ছিল না।

শীতের হাওয়ায় না মনের কনকনানিতে হি-হি করে কেঁপে ওঠে সুপ্রিয়া কে জানে! করুণ চোখে দেখে খোকনকে। আর করুণা করতে চায় রথীনকে। এক গৌরবের মহিমা থেকে ওকে যেন বঞ্চিত করেছে সুপ্রিয়া।

একটা কাজ করতে পার রথীন ?

কি ?

সত্যি কথাটা স্বীকার করতে পার ?

তুমি পার না ?

কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। আমি খোকনের মা—

আমিও যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি সুপ্রিয়া—

না, বাধা দিয়ে সুপ্রিয়া বলে, খোকন কোনদিনও তোমাকে জানবে না।

কিন্তু আমি তো ওকে জানব।

না না রথীন, এ হয় না। ক্ষিপ্ত একটা চিৎকার দিয়ে সুপ্রিয়া বলে, তুমি সব গোপন সত্য প্রকাশ করে দাও !

দৃঢ়স্বরে রথীন বলে, না।

কিন্তু কেন ? কার জন্যে তোমার এই দুঃখভোগ ?

একটু থেমে সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করে, আমার জন্যে ? আমার স্বামীর জন্যে ?

না।

তবে ?

একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে হাসে রথীন, আমার কোন দুঃখ নেই।

যন্ত্রণা ?

না।

ভয় ?

রথীন হেসে বলে, তাও নেই সুপ্রিয়া।

তাহলে অসময়ে চোরের মত এ বাড়িতে তুমি আস কেন ?

সিগ্রেটের ধোঁয়া শীতের নিঃঝুম মধ্যাহ্নে অপূর্ব এক রুপোলি জাল বোনে রথীনের চোখের সামনে। দু-এক মিনিট সে বোধহয় চোখ বুজেই বসে থাকে চুপচাপ।

সুপ্রিয়ার উষ্ণ স্বর কাঁপে, বল ?

তুমি আমি আর খোকন, থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা বলে রথীন, এই তিনজন মানুষ যদি কিছুক্ষণের জন্যে তৃপ্তির একটা জগৎ রচনা করে নিতে পারে, তাহলে অন্য কাউকে সেখানে এনে শুধু শুধু ছন্দ কেটে দেয়ার দরকার কি ?

কিন্তু সত্যি কথা প্রকাশ করে দিয়ে এই তিনজনকে নিয়ে চির-কালের জন্যে তুমি একটা আলাদা জগৎ রচনা করতে পার না ?

রথীন হেসে বলে, না।

কেন পার না রথীন ?

কিছু দেখতে পায়না সুপ্রিয়া কিন্তু বুঝতে পারে রথীনের মুখ ঘিরে করুণ একটা ছায়া কাঁপে। আর অদ্ভুত সবুজ রঙ যেন সে ছায়ার।

সুপ্রিয়ার একবার ইচ্ছে করে হাত দিয়ে সে ভিজে সবুজ ছায়া স্পর্শ করতে। কিন্তু পারে না।

মৃদু সঙ্গীত-ঝঙ্কারের মত মনে হয় রথীনের গলার স্বর, বিমল তাহলে কোথায় যাবে ?

আঘাতের ঠাণ্ডা ঝাপটা লাগে সুপ্রিয়ার মুখে। তবুও সে রথীনের কথার উত্তর দেয়, মিথ্যা সম্পর্কের গর্বে সে আমাদের জগতে থাকবেই বা কেন ?

কি মিথ্যা সুপ্রিয়া ?

আমি, খোকন। তার কাছে আমরা দুজনেই মিথ্যা—

ম্লান হেসে রথীন বাধা দেয়, খোকনের কথা জানি না—তোমার কাছে বিমল মিথ্যা হয়ে গেলেও এখনও তার কাছে তুমি সত্য বলেই সে অনেক ওপরে উঠে গেছে।

কিছু না বুঝে সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করে, মানে ?

মানে ? আবার যেন সুপ্রিয়াকে পাল্টা প্রশ্ন করে রথীন,

তোমাকে আর খোকনকে নিয়েই সে নিজের কাছে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে।

তাতে আমার কি? যেন তখনও কিছু বোঝে না সুপ্রিয়া। কিম্বা বুঝলেও না বোঝার ভান করে।

রথীন বলে, তাতে খোকনের মঙ্গল।

কিন্তু রথীনকে দেখতে দেখতে হঠাৎ জ্বলে ওঠে সুপ্রিয়া। টেবিলের ওপর থেকে কাগজ-চাপাটা তুলে ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে চায়। সব দায়িত্ব এড়িয়ে রথীন এখন যেন সেই এক নিয়মের দড়ি ধরে ঝুলে পড়তে চায়। নিজে জ্বলবে তবু মুখ খুলবে না। মন-গড়া যুক্তির মুখোশ পরে সুপ্রিয়ার কানের কাছে শুধু প্রলাপ বকবে।

সুপ্রিয়া চিৎকার করে বলে, না। আর একজনকে বাপের সম্মান দিলে কি মঙ্গল হবে তার?

সুপ্রিয়ার চোখে আঙুল দিয়ে যেন কিছু একটা দেখিয়ে দিতে চায় রথীন, কিন্তু সত্যি কথা শুনলে ও কাকে সম্মান করবে?

একটু থেমে মুখে কৃত্রিম একটা হাসি ফুটিয়ে রথীন বলে, তোমাকে কিম্বা আমাকে—ও হয়তো কাউকেই মনে মনে স্বীকার করতে চাইবে না। তখন তুমি কি করবে সুপ্রিয়া?

যেন রথীনের কথা কিছুতেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়, এমনভাবে সুপ্রিয়া বলে, ওকে বিমলের কাছে ফেলে আমি একা একা অনেকদূরে কোথাও চলে যাব—

কথা শেষ করে না সুপ্রিয়া। আস্তে আস্তে একটা হাত রাখে খোকনের মাথায়। যেন অসহ্য এক যন্ত্রণায় ওর ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। এখন রথীনের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করে না ওর।

দিনের আলো নিভে আসে। এক সুরে কোথায় একটা কাক

আরও কিছুক্ষণ রথীন বসে থাকে চুপচাপ। এখান থেকে চলে যেতে চায় কিন্তু পারে না। অবশ হয়ে গেছে ওর দেহ। কঠিন শীতের আঘাতে মূক জর্জর একটা গাছের মত স্থির হয়ে থাকে সে। আর রক্তে-রক্তে অনুভব করে যন্ত্রণার নির্মম প্রহার।

এতক্ষণ যত কথা সুপ্রিয়াকে বলেছে রথীন—নিজে যেন তার কোনটাই মেনে নিতে পারে না। আর সুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছেও ওর চলে যায় এখন।

এক সময় তাকে কিছু না বলেই ও আস্তে আস্তে উঠে যায় সে-ঘর থেকে। সোজা রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

রথীন চলে যায় কিন্তু সুপ্রিয়া বসে থাকে যেমনকার তেমন। মাঝে মাঝে হাত নেড়ে খোকনের কপালের ওপর থেকে দু-একটা মাছি তাড়ায়। একটু বেশি শীত লাগে ওর এ সময়।

মনের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে সুপ্রিয়া কি একটা খুঁজতে চায় আবার। এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে যেন মুক্তি চায়।

হঠাৎ যেন আগুনের শিখা কাঁপে ওর চোখের তারার-তারায়। হিংস্র দৃষ্টিতে দেখে খোকনকে। মাতৃত্বের কথা ভুলে যায়। ওর ঘুম-ছোটানো কামনার কথাও এখন তার মনে থাকে না। যেন ওই ছোট্ট মানুষটাই দায়ী তার এই অসহায় অবস্থার জন্যে।

এখন কি করবে সুপ্রিয়া?

গয়লা কড়া নাড়ে ঠিক সময়। ঝি ঘুম থেকে ওঠে। পাড়া বেড়িয়ে চাকরটাও ফিরে আসে সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময়। আর তখন যেন সুপ্রিয়ার মনের কথা বুঝতে পেরে খোকন জোরে কেঁদে ওঠে। সব ভুলে তাকে আদর করতে করতে সুপ্রিয়া তার কান্না থামায়।

আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে কত ঝড় কত ঝাপটা সুপ্রিয়ার মনকে

এক মহাসাগরের মত উদ্বেল করে তোলে। ঠিক তেমন ভাবেই সেই এক জায়গায় এখনও আছে সে।

সেই স্বামী। সেই নিয়ম। সেই অভ্যাস। আর সেই যন্ত্রণা। সেদিনও সব ঠিক এমনি ছিল। হ্যাঁ, একটা জ্বালাও ছিল তার মন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। কিন্তু সে-যন্ত্রণার মধুর একটা স্বাদও ছিল। আর তা ছিল বলেই আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠেছিল সুপ্রিয়ার।

আর এখন? তেতো-তেতো হয়ে গেল মন। মাথাটা দপদপ করে সারাক্ষণ। সেদিন যে-কোন মানুষকে জয় করে নেয়ার উগ্র নেশা ছিল তার রোমকূপের ফাঁকে-ফাঁকে। আর আজ আছে শুধু সমর্পণের ম্লান সিক্ত একটা ইচ্ছা। যেন আজকের যত অভ্যাস আর নিয়ম—সবই সে মেনে নিতে চায়।

কিন্তু মেনে নিতে চাইলেও সংসারের চাকাটাই যেন তাকে ঠেলে বের করে দিতে চায়। আজও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না বলে সুপ্রিয়া হাঁপায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আর সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, এক-একটি দিন—এক-একটি মুহূর্ত ওকে কুরে কুরে খায়। তিল তিল করে যেন শেষ হয়ে যায় সুপ্রিয়া।

একটা গাড়ীর হর্ন বাজে বাইরে। বোধহয় ট্যাক্সি করে বিমল ফিরেছে। ছেলেকে দেখবার জন্যে যেন ঘুম হয় না ওর। পায়ের শব্দ শুনতে পায় সুপ্রিয়া। খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি টপকে বিমল ওপরে উঠে আসছে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ লজ্জা পায়। তার ভাবনার কথা যেন বিমল কিছুতেই জানতে না পারে। পাউডারের পাফটা একবার বুলিয়ে নিলে হত মুখে। আলোটা আর একটু আগেই তো সে জ্বালিয়ে

নিতে পারত। এমন থমথমে মুখ করে নিরানন্দের ছায়া কাঁপিয়ে আস্তে আস্তে মরে যাওয়ার মানে কি!

কিন্তু কিছুই করবার সময় পায় না সুপ্রিয়া। হুড়মুড় করে বিমল এসে ঘরে ঢোকে। তার হাতে একরাশ খেলনা। অন্ধকারে খোকনের খাটের কাছে আসতে গিয়ে জোরে একটা চেয়ারে ধাক্কা খায় বিমল। আর হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বুকের কাঁপন দ্রুত হয় সুপ্রিয়ার।

আলো জ্বালাও নি যে?

জ্বালিয়ে নাও না গো।

টক করে সুইচ টিপে বিমল বলে, সারা দুপুর খুব জ্বালিয়েছে বুঝি দুষ্টুটা?

ম্লান হেসে সুপ্রিয়া বলে, হ্যাঁ।

এই দেখ খোকন, ঝুম-ঝুম করে একটা ঝুমঝুমি খোকনের মুখের কাছে বাজাতে বাজাতে বিমল বলে, তোমার জন্যে কি এনেছি!

খোকন চোখ খুলে শুধু তাকিয়ে থাকে বিমলের দিকে। হাসে কিনা বোঝা যায় না। ওর দৃষ্টি হয়েছে কিনা তাও জানে না বিমল।

তবু ওর খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে ঝুমঝুমি বাজায়।

আলোটা যেন বিমল না জ্বালালেই ভাল করত।

আজকাল অন্ধকার অনেক ভাল লাগে সুপ্রিয়ার। যদিও একবারও তার দিকে ফিরে দেখছে না বিমল। লক্ষ্য করছে না যে সে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। এখনও একটা গরম জামা গায়ে দেবার তার সময় হয়নি। তার চোখের কোণে কালি পড়েছে। সে থেকে থেকে বিকট এক আতঙ্কে চমকে উঠছে—কিছুই লক্ষ্য করছে না বিমল।

আর একটা মানুষ যে ঘরের মধ্যে আছে, সে খেয়ালও বুঝি তার নেই।

প্রতিবাদের সুরে সুপ্রিয়া বলে, এত পয়সা নষ্ট করে এসব আন কেন? ওর কি খেলবার বয়স এখন?

কোট খুলতে খুলতে বিমল বলে, থাক না। বড় হয়ে খেলবে।

তোমার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

ওর গায়ে একটা চাপা দাও। ঠাণ্ডা লাগবে যে।

কিছু গায়ে দিতে চায় না। ফেলে দেয়—

এত দুষ্টু হয়েছে?

হ্যাঁ। ভীষণ দুষ্টু—

সুপ্রিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিমল বলে, হবেই। আমিও ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলাম।

চোখ বন্ধ করে সুপ্রিয়া। আর শুনতে চায় না বিমলের কথা। সিরসির করে কি যেন উঠছে তার গা বেয়ে বেয়ে। আরসোলা না শীতের পোকা—কে জানে।

বিমল কি এখনও তাকিয়ে আছে তার দিকে? কোন ছায়া পড়েছে কি তার মুখে?

চোখ খুলে সুপ্রিয়া আবার বিমল আর খোকনকে দেখে। না, বিমল দেখছে না তাকে। সে খোকনকেই দেখছে। আর কটাক্ষের কোন ইঙ্গিত নেই তার চোখে।

তাহলে তার কথা শুনে সুপ্রিয়া শুধু শুধু চমকে ওঠে কেন? কেন ভয় পায়?

এখানে আর বসে থাকতে চায় না সুপ্রিয়া। তারই চোখের সামনে প্রকাণ্ড এক মিথ্যা অল্পে-অল্পে রুপোলি চাঁদের মত মধুময় সত্য হয়ে উঠছে—তা সে নিজের বুকজোড়া দৈন্যের জন্যেই বোধহয়।

সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু বিমল বোধহয় সব পারে। কী অলৌকিক ক্ষমতায় সে সৃষ্টি করেছে এক আশ্চর্য পরিবেশ! একটা মিথ্যা—যা মানুষকে উন্মাদ করে দেয়—তাকে কী ক্ষমতায় বশ করে নিজেকে পূর্ণ করে তুলেছে বিমল লোকাতীত মহিমায়।

আর রথীন? সুপ্রিয়া নিজে? যে ফাঁস একদিন গলা থেকে খুলে সে মুক্তি চেয়েছিল—তা খুলতে গিয়ে বাঁধন আরও দৃঢ় হল।

আর একটি মানুষের গলায় সেই এক ফাঁস পরিয়ে তাকেও যেন মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দিল সুপ্রিয়া। বিমলের মত খোকনের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সোহাগ জানাবার সাহস কিম্বা অধিকার—যেন কোনটাই নেই রথীনের।

সবই তো বুঝতে পেরেছে বিমল। তাহলে? কেমন করে ছেলেটাকে নিয়ে এত মাতামাতি করে? শুধু লোকনিন্দার ভয়ে এমন অকৃত্রিম পিতৃত্ব মানুষ মেনে নিতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না সুপ্রিয়ার। আরও কিছু আছে বিমলের।

কিন্তু তা যে কি—অনেক চেষ্টা করেও সে তার সন্ধান পায় না।

এদের দুজনের মাঝখানে সে যেন বেমানান। সে থাকলে হঠাৎ একসময় বিমলের স্বাভাবিক মূর্তিটা হয়ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। তাকে কেমন করে সহ্য করতে পারবে বিমল?

কোন কথা না বলে অন্য ঘরে চলে যায় সুপ্রিয়া।

এখন সরে গেলেও গভীর রাতের অন্ধকারে যেন একটা ভয় তার দেহমন আঁকড়ে ধরে। অনেকক্ষণ সে ঘুমতে পারে না। খোকন ঘুমচ্ছে। বিমলের চোখেও গভীর ঘুম। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া এই শীতের থমথমে ভারী মুহূর্তে আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

কিন্তু কেন ঘুম আসে না সুপ্রিয়ার ?

একটা আতঙ্ক যেন মিশে আছে মশারির ফাঁকে-ফাঁকে। একটা আক্রোশ—প্রতিহিংসার তীব্র একটা বাসনা যেন বিমলের হৃদয় চিরে-চিরে প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসছে।

হয়তো বিমল জেগেই আছে। সুপ্রিয়া ঘুমিয়ে পড়বার পরই সে উঠে বসবে। অন্ধকারে তার নিষ্ঠুর চোখ জ্বলে উঠবে। আর তারপর ?

কাকে সে আগে শেষ করবে ? মাকে না ছেলেকে ? চমকে উঠে খোকনের আরও কাছে সরে আসে সুপ্রিয়া। দুই বাহু দিয়ে তাকে যেন আগলে রাখে। আর বোধহয় তার জন্যেই নিজেও শেষ হয়ে যেতে চায় না।

কোন উত্তাপ বুঝি এখন নেই পৃথিবীর কোথাও। আর একটু পরে—যদি সুপ্রিয়ার চোখে হঠাৎ এক সময় ঘুম নেমে আসে—তা হলে আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে চারপাশ। বরফের একটা বিরাট চাঁই শুধু স্থির হয়ে থাকবে মশারির ভেতর। বিমলের হাতের মৃদু চাপেই খোকনের দেহ বরফ হয়ে যাবে।

দ্রুত নিশ্বাস ঝরে সুপ্রিয়ার।

*

তন্দ্রার ভারে কখন ঝিমিয়ে পড়েছিল সুপ্রিয়া। কিন্তু খোকনের কান্নার আওয়াজে সে উঠে বসে। ও কি ? বিমলের হাত এগিয়ে এসেছে খোকনের গলার কাছে। খোকন চিৎকার করছে।

ঘুমের ঘোরে আর্তনাদ করে ওঠে সুপ্রিয়া, কি—কি করছ তুমি ?

বিমল অবাক হয়ে সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকায়, কি হয়েছে ?

স্বামীর হাত গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরেছে তখন সুপ্রিয়া, ওর কি দোষ? ওকে মারছ কেন?

সেই অন্ধকারেই হেসে ওঠে বিমল, তোমার ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি। ঘুমোও—ঘুমোও! আমিই খোকনকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারব।

এতক্ষণ পর সত্যি ঘোর কেটে যায় সুপ্রিয়ার। ভয়ের শেষ রেখাটাও মিলিয়ে যায় কপাল থেকে। এখন কোথাও বুঝি আর ঠাণ্ডা নেই। কিন্তু আকণ্ঠ লজ্জায় তার দেহটা ভারী হয়ে যাচ্ছে কেন! বিমল কি দেখতে পাচ্ছে তার মুখ!

একটা কিছু বলতেই হবে। না হলে তাকে কি ভাববে বিমল। কিন্তু কি কথা এখন বলবে সুপ্রিয়া? তার আতঙ্কের কথা ও কি বুঝতে পেরেছে?

অন্ধকারে খোকনকে দেখতে দেখতে সুপ্রিয়া যেন আপনমনেই বলে ওঠে, হঠাৎ বুঝি কেঁদে উঠল?

হ্যাঁ।

কাল অফিসে তোমার খুব ঘুম পাবে।

ছোট একটা হাই চেপে বিমল বলে, না।

বেড সুইচ টিপে সুপ্রিয়া আলো জ্বালায়। কাঁথার ওপর হাত বুলিয়ে নেয়। তারপর কোলে তুলে নেয় বাচ্চাটাকে। আর কৌশলে একবার তাকায় বিমলের মুখের দিকে।

একটু খাইয়ে দিই?

কি দরকার? ঘুমচ্ছে তো এখন। একটু কাঁদলেই বুঝি খাওয়াতে হয়?

রাত্তিরেই দেখি ওর যত আব্দার শুরু হয়—আর একটু পরেই দেখো—আবার কেঁদে উঠবে।

ওকে শুইয়ে দাও সুপ্রিয়া—আলো নিবিয়ে তুমিও ঘুমোও।

খোকনকে সাবধানে কোল থেকে নামাতে নামাতে সুপ্রিয়া বলে, আর তুমি ?

আমিও ঘুমব, বিমল হেসে বলে।

আলো নিভে যায়। কথা বন্ধ হয়। আবার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। আবার ঠাণ্ডার হিম আমেজ।

কিন্তু ঘুম নেই সুপ্রিয়ার চোখে।

॥ চার ॥

সবই প্রায় ঠিক আছে। অনেক বছর পরের আর এক শীতকাল। সেই কলকাতা শহর। তবে ডোভার লেনের সেই ফ্ল্যাটটা এখন আর নেই। অন্য আর একটা বাড়ি। বড় গেট। সামনে একটা ফুলের বাগান।

বিমল বাড়ি করেছে বছর খানেক আগে।

এ বাড়িতে উঠে আসবার আগের দিন অবধি ওরা সে ডোভার লেনের তেতলার ফ্ল্যাটেই ছিল। যদিও বলিগঞ্জেই নিজের বাড়িতে উঠে যাচ্ছে তবুও খোকনের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় চোখ দুটো চিক চিক করে উঠেছিল সুপ্রিয়ার। বারবার ও পিছন ফিরে তাকিয়েছিল।

কি একটা ছিল যেন এ বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে, জানলার শিকে-শিকে। অনেক বিদ্রোহ—অনেক দীর্ঘশ্বাস—সুপ্রিয়ার অনেক গোপন অভিযানের কাহিনী।

নতুন বাড়িতেও যাবে কি রথীন?

হ্যাঁ, রথীন এখানেও আসে।

দুপুরবেলা চোরের মত বিমলের অলক্ষ্যে নয়, যে-ই থাকুক না কেন বিমলের নিজের বাড়িতে, সকলের সামনে দিয়েই সোজা হেঁটে আসে রথীন। ক্লান্ত করুণ একটা মূর্তি। কোন দিকে না তাকিয়ে

বসবার ঘরের সেই এক চেয়ারেই বসে পড়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে খোঁজে।

এ দৃষ্টির অর্থ বোঝে সুপ্রিয়া।

না, সে ঘরে না এলেও তাকে খোঁজে না রথীন। না খুঁজুক। তার জন্যে কোন দুঃখ এখন আর সুপ্রিয়ার নেই। রথীন দেখতে চায় খোকনকে। বোধ হয় জোর করে তার মাথাটা বুকে গুঁজে কিছুক্ষণ কাঁদতেও চায়।

সুপ্রিয়াকে যদিও এমন কথা কোনদিনও বলে নি রথীন, তবুও সমবেদনার ছায়া-ছায়া একটা ঘোর রথীনের মনের কথা তাকে যেন জানিয়ে যায়।

ওকে ডাকব? রথীন কিছু বলবার আগেই সুপ্রিয়া দূর থেকেই জিজ্ঞেস করে।

ভিজে-ভিজে চোখ তুলে যেন ক্লান্তি ঝেড়ে নেয় রথীন। তারপর ভয়ে-ভয়ে বলে, ও কোথায়?

বোধহয় ওপরে খেলা করছে।

খুব আস্তে রথীন বলে, একবার ডাক না!

সুপ্রিয়া ওঠে না। সেখানে বসেই ডাকে, খোকন!

ওপর থেকে চঞ্চল একটা সাড়া ভেসে আসে, যাই মা।

তারপর সিঁড়িতে ছোট পায়ের দুপদুপ শব্দ। কোঁকড়াচুলো ফর্সা খুশিখুশি একটা মুখ পর্দা ঠেলে ঘরের মধ্যে যেন তাজা জীবনের একমুঠো মিষ্টি রঙ ছড়িয়ে দেয়।

কিন্তু তা মাত্র এক মুহূর্তের জন্যেই। রথীন দেখে। সুপ্রিয়াও। খোকনের বড় বড় চোখ দুটো হঠাৎ যেন ছোট হয়ে যায়। পাছে রথীনকে দেখতে হয়—পাছে সে তাকে কাছে ডেকে আদর করতে চায়, তাই সে ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, রোজই এমন হয়। কেন খোকন এমন করে—ওরা কেউই বুঝতে পারে না।

খোকন, সুপ্রিয়া ডাকে।

কি মা?

তোমার রথীনকাকা এসেছেন।

খোকন কোন কথা বলে না। এখনও তাকায় না রথীনের দিকে।

ছেলেটা কেন এমন করে? ওর দুই গালে ঠাসঠাস করে দুটো চড় মারতে ইচ্ছে করে সুপ্রিয়ার। কিন্তু আর কি কথা বলবে ও ভেবে পায় না।

এবার ওকে কাছে ডাকে রথীন, খোকন আমার কাছে আসবে না?

দম দেয়া কাঠের একটা পুতুল যেন এগিয়ে আসে রথীনের কাছে, কি?

পকেট থেকে খুব বড় দুটো চকোলেটের শ্ল্যাব বের করে রথীন বলে, তুমি চকোলেট খেতে খুব ভালবাস, না খোকন?

ঘাড় গুঁজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে খোকন। রথীনের কথার উত্তর দেয় না। হাত বাড়িয়ে চকোলেট দুটো নেয়ও না।

সুপ্রিয়া ধমক দিয়ে বলে, নাও খোকন।

যন্ত্রের মতই তখন রথীনের হাত থেকে চকোলেট নেয় সে। আর রথীন আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত দেয়। দূরে পালিয়ে যায় না খোকন কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হয় যে এ স্পর্শ সে সহ্য করতে পারছে না। এখান থেকে ছুটে পালাতে পারলেই সে যেন বেঁচে যায়। ঘুরে ঘুরে সে দরজার দিকে তাকায়।

তবুও রথীন জিজ্ঞেস করে, একদিন আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?

খোকন বলে, আমি বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাব—

সুপ্রিয়া তাকাতে পারে না রথীনের দিকে। একটা নিশ্বাস জোর করেই বুকের মধ্যে চেপে নেয় রথীন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে বিমলের সজীব গলার স্বর ভেসে আসে, খোকন!

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খোকনের। যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগে তার ছোট্ট শরীরে।

গলা ছেড়ে সে উত্তর দেয়, যাই বাবা!

আর কারুর দিকে তাকায় না খোকন। ঘরের পর্দা ঠেলে তিন লাফে ওপরে বিমলের কাছে চলে যায়।

যাবার সময় দরজায় ধাক্কা লেগে চকোলেট পড়ে যায় তার হাত থেকে। কিন্তু আবার তা তুলে নেবার জন্যে সে পিছন ফিরে তাকায় না।

সুপ্রিয়া চিৎকার করে বলে, খোকন, তোমার চকোলেট নিয়ে যাও—

ম্লান হেসে রথীন বলে, থাক। আমার কাছ থেকে ও কিছু নেবে না। তুমি বোঝ না সুপ্রিয়া।

ভাঙা-ভাঙা স্বরে সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কেন ও কিছু নেবে না তোমার কাছ থেকে?

বুকের সেই দীর্ঘনিশ্বাসটা এতক্ষণ পর ছেড়ে রথীন বলে, কী জানি!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুপ্রিয়া বলে, ছেলেটা কেন এমন হল!

ওর কিছু হয় নি। ও ঠিকই আছে।

কিন্তু কই, আর কারুর সামনে তো ও মুখ বুজে থাকে না, কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সুপ্রিয়া বলে, ওর বাবার কত বন্ধু আসে এ

বাড়িতে—

হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠে রথীন সুপ্রিয়াকে যেন থামিয়ে দেয়, ওর বাবার বন্ধু বলেই সে তাদের আপনার লোক বলে মনে করে—

রথীনের হাসির অর্থ না ধরতে পেরেই সুপ্রিয়া বলে, কিন্তু তুমি যে ওর বাবার বন্ধু না, সে-কথাটাই বা ও ধরে নেয় কেমন করে?

কারণ আমি তোমার কাছে আসি, একটু থেমে রথীন আবার বলে, আর ওর বাবা কখনও তো আমাদের মধ্যে এসে বসেন না। তাই ও বোধহয় ওর বাবার মতই আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায়।

কথা বলতে বলতে শেষের দিকে রথীনের গলা প্রায় ধরে আসে। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে ও তাড়াতাড়ি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বোধহয় সুপ্রিয়ার কাছ থেকে নিজের ভারী মনটাকে আড়াল করে রাখতে চায়।

সুপ্রিয়া বলে, তুমি কি করবে রথীন?

কিছু বুঝতে না পেরে রথীন বলে, কিসের?

সারা জীবন ধরে একটা মিথ্যাকে তুমি মুখ বুজে প্রশ্রয় দিয়ে যাবে?

হ্যাঁ, সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে অল্প-অল্প হাসে রথীন, মিথ্যা সত্য নয় সুপ্রিয়া—এটাই নিয়ম। এমনি করেই সম্পর্ক গড়ে—সম্পর্ক ভাঙে।

পাখির মত সুপ্রিয়া প্রশ্ন করে, কিন্তু যে-সম্পর্ক ভাঙা যায় না তার কি হবে?

কি ভেবে রথীন বলে, সম্পর্ক বলে কিছু নেই। সবই ভাঙা

যায়—সবই গড়া যায়। আসলে আমরা সকলেই অভ্যাসের দাস—

চমকে উঠে সুপ্রিয়া বলে, না না, এসব কথা বল না—

তবুও রথীন থামে না। কথা বলে যায়। আর কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে বাইরে তাকায়। এখুনি সে জানলা দিয়ে দেখবে হাত-ধরাধরি করে দুটি মানুষ গেট খুলে বেরিয়ে যাবে। বিমল আর খোকন।

পাতলা অন্ধকারেই স্পষ্ট দেখবে রথীন যে গেট বন্ধ করবার সময় মূক দৃষ্টিতে দুজনেই একবার এই আলো-জ্বলা ঘরের দিকে তাকাবে।

তারপর গটগট করে মিলিয়ে যাবে অন্ধকারে।

সুপ্রিয়া আর রথীন থরো থরো শীতের সন্ধ্যায় যখন বন্দী হয়ে থাকে চার দেয়ালের মাঝে আর যখন কথা বেরিয়ে আসে ওদের বুক চিরে-চিরে তখন এ সংসারে অন্য দুজন মানুষ অলৌকিক এক সম্পর্কের জোরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আকাশ দেখে। কাঁপা-কাঁপা তারা গোণে।

হয়তো বিমল জিজ্ঞেস করে, আজ কোনদিকে বেড়াতে যাবে খোকন ?

অনেক দূরে, গট গট করে আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে খোকন বলে, তুমি আর আমি যদি হারিয়ে যাই তাহলে কি হবে বাবা ?

খোকনের কথা বুঝতে না পেরে বিমল ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় তার দিকে, হারিয়ে যাবে কেন ?

সুপ্রিয়াকে জব্দ করবার একটা প্রচ্ছন্ন সুর বোধহয় কাঁপে খোকনের স্বরে, তাহলে মা কাঁদবে আমাদের জন্যে—আমাদের কোথাও খুঁজে পাবে না—

খোকনকে বাধা দিয়ে বিমল নিশ্চয়ই তার কচি মনের জ্বালা মুছিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মাকে না দেখে কেমন করে থাকবে তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে খোকন বলে, রোজ সন্ধ্যেবেলা আমরা দুজন হারিয়ে যাব আর সকালবেলা যখন মা রান্নাঘরে থাকে তখন ফিরে আসব।

কথা ঘুরিয়ে খোকনের মনকে বিমল অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তুমি যখন অনেক বড় হবে খোকন আর একা-একা বিদেশে চলে যাবে লেখাপড়া করতে তখন দেখবে যে এই পৃথিবীটা কত বড় আর কত রকমের মানুষ যে আছে এখানে—

তুমি সকলকে চেন বাবা?

না খোকন, বিমল হেসে বলে, সকলকে চেনা যায় না।

আমি সকলকে চিনতে পারব, বিমলের হাতে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে খোকন বলে, আমাদের ইস্কুলের সব ছেলেকে আমি চিনি আর সব মাষ্টারমশাইদেরও—

ওই দেখ খোকন, আকাশে একটা তারা ফুটে উঠল—

আকাশে কত তারা আছে বাবা?

গোনা যায় না।

এই পৃথিবীর মানুষের চেয়ে বেশি?

ঠিক উত্তর দিতে না পেরে অল্প-অল্প হাসতে হাসতে বিমল বলে, বোধহয় না।

খোকনও হাসে তখন, তবে আমি সব মানুষকে ঠিক চিনতে পারব বাবা!

আর চলতে চলতে বিমলের কাছ থেকে কত গল্প শোনে খোকন। এই পৃথিবীর ইতিহাস—অসংখ্য মানুষের উত্থান-পতনের কাহিনী।

কিম্বা—ঠিক বুঝতে পারে না রথীন আর সুপ্রিয়া—কি কথা শোনায় খোকনকে বিমল।

রোজই বিমল ঠিক সময় ফিরে আসে অফিস থেকে। আর আশ্চর্য, খোকনও বাইরে তাকিয়ে বসে থাকে চুপচাপ তার অপেক্ষায়। ওকে দেখতে দেখতে সুপ্রিয়া হাসে। ওকে দেখতে দেখতে সুপ্রিয়া কাঁদতে চায়। আর সব কথা ভাবতে ভাবতে সে মরে যেতে চায়।

ও যেন এ বাড়ির কেউ নয়। বিমল তাকে কোন শাস্তি দেয় নি—হয়তো দূরেও সরিয়ে দেয় নি। কিন্তু সুপ্রিয়া বুঝতে পারে না কেমন করে দুজনের মাঝখানে মাথা তুলেছে দূরত্বের একটা কঠিন দেয়াল। একই বাড়িতে আছে দুজন এত কাছাকাছি, তবু কত দূরে।

খোকন আর বিমল—সুপ্রিয়া যেন ওদের কেউ নয়।

যে কামনা, যে দাহ একদিন সুপ্রিয়াকে উন্মাদ করেছিল, আজ ঠিক তেমনি আর এক ঝাঁজ তাকে পুড়িয়ে মারে। এই যন্ত্রণা তাকে সকলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। তার সঙ্গে যেন কারুর কোন সম্পর্ক নেই।

যদি বিমল তাকে অবহেলা করত, কঠিন স্বরে দিন-রাত তাকে খোঁচা মারত, তাহলে হয়তো সুপ্রিয়া বাঁচতে পারত। কিম্বা বিমল কিছু না জানত—না বুঝত, তাহলে এমন একা-একা তার দিন কাটত না। সে হয়তো তার ছেলে আর স্বামীর সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারত।

তার সামনে রথীন বসে আছে চুপচাপ। কাছাকাছি আর কোন মানুষ নেই। কিন্তু কেন কথা নেই রথীনের মুখে? কেন তার কাছে আজ সুপ্রিয়ার কোন মূল্য নেই?

সোফার ওপর প্রথমে সুপ্রিয়া সোজা হয়ে বসে। ভয়ঙ্কর এক দৃষ্টিতে তাকায় রথীনের দিকে। একটু ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের আরও একটা জোরালো বাল্‌ব জ্বালিয়ে দেয়। তারপর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে রথীনের দিকে।

কথা বলছ না যে ?

যন্ত্রের মত ম্লান হাসে রথীন। সুপ্রিয়ার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না ! শুধু তার দিকে ক্লান্ত একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। আর তার দেয়া চকোলেটের যে প্যাকেট দুটো খোকন ফেলে গেছে দরজার কাছে, সে-দুটোর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

খোকনের ভাবনা ছাড়া আজ আর কোন ভাবনা কি তোমার নেই ?

চমকে উঠে রথীন বলে, আছে—

না নেই। ওই এক ভাবনায় তুমি শেষ হয়ে যাচ্ছ আর আমিও শেষ হয়ে যাচ্ছি, এক মুহূর্তের জন্যে থামে সুপ্রিয়া, কিন্তু কেন এই ফুরিয়ে যাওয়ার খেলা খেলছি আমরা দুজন, আর—

ম্লান হেসে রথীন বলে, বল !

অন্য দুজন ? কই, তারা তো এমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে না ?

তোমার চোখ—তোমার মুখ—এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুপ্রিয়া হঠাৎ রথীনের হাত চেপে ধরে বলে, একদিন তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে—আমার সবচেয়ে বড় কামনা পূর্ণ করেছিলে—জান, আজ এক কথায় আমিও তোমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি ?

থেমে থেমে রথীন বলে, আমি তো বেঁচেই আছি।

খোকনকে বলব ?

কি ?

তুমি তার কে।

অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে সুপ্রিয়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে রথীন। ভয়ের অস্পষ্ট একটা রেখা পড়ে তার কপালে। কিন্তু সুপ্রিয়া বুঝতে পারে যে সে নিজেকে কৌশলে সামলে নেয়। আর আস্তে আস্তে তার মুঠি থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়।

গম্ভীর স্বরে কথা বলে রথীন, কেন ?

তাহলে সে তোমার দেয়া সব কিছু এমন করে ফেলে যেতে সাহস করবে না—

সুপ্রিয়ার কথা শেষ হবার সঙ্গে রথীন বলে, শুধু মুখের একটা কথায় পুরনো সম্পর্ক ভেঙে নতুন কিছু গড়ে ওঠে না। এ সব করলে হবে কি, ও ভবিষ্যতে কাউকেই শ্রদ্ধা করতে পারবে না।

না পারুক, কিন্তু তোমার চোখের সামনে ও অন্য আর একজনের হাত ধরে বেরিয়ে যাবে আর তুমি ওকে দেখবার জন্যে—ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বসে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সুপ্রিয়া থেমে যায়। তার কথা রথীন শুনছে কি না কে জানে। জানলা দিয়ে ও তাকিয়ে আছে গেটের দিকে। খোকন ফিরলে দূর থেকে সে ওকে আর একবার দেখবার চেষ্টা করবে।

সবই জানে সুপ্রিয়া। কিন্তু এখন সে আর কোন কথা বলতে চায় না। যখন সুপ্রিয়া কথা বলছিল আর রথীনের দৃষ্টি লক্ষ্য করে থেমে গিয়েছিল হঠাৎ তখন সে ভেবেছিল রথীন প্রতিবাদ করে বলবে, না সুপ্রিয়া, শুধু খোকনকে দেখতে নয়—আমি তোমাকেও দেখতে আসি।

হোক মিথ্যা, কিন্তু তা যদি সুপ্রিয়ার মনে সান্ত্বনার একটা মধুর প্রলেপ বুলিয়ে দেয় অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তাহলে কার কি ক্ষতি !

এখন রথীনের মুখের দিকে সুপ্রিয়া আর তাকায় না। হাতের কাছে একটা ছোট আয়না থাকলে হয়তো নিজের চেহারাটা দেখত একবার।

কী এমন পরিবর্তন হয়েছে তার!

একটু স্থূল হয়েছে দেহ। চলার গতি হয়েছে শ্লথ। আর রূপ দিয়ে পৃথিবী জয় করবার নেশা হয়তো এখন আর নেই। কিন্তু তার নারীত্বের অহঙ্কার?

রথীন আজ সেকথা বোঝে না কেন!

কিন্তু মুখ ফুটে তাকে কিছু বলবার ক্ষমতা নেই সুপ্রিয়ার। সে তো সবই জানে। সবই বোঝে।

এখান থেকে আকাশ দেখা গেলে হয়তো সুপ্রিয়া দেখত সেই পুরনো চাঁদের ফালি আর তার কাছাকাছি স্থির একটা তারা। পৃথিবীর সেই পুরনো ঘ্রাণই তার নাকে এসে লাগত।

শুধু তার মনের সেই ইচ্ছাগুলো নিভে গেছে। আর ওরা দুজনেই জ্বলন্ত ইচ্ছার ধাপ পেরিয়ে কখন এক সময় পৌঁছে গেছে স্তিমিত আলোর মহান এক চূড়ায়। ইচ্ছা পরিণত হয়েছে ধৈর্যে। কামনা পরিণত হয়েছে মাতৃত্বে আর পিতৃত্বে।

তাই আজ সুপ্রিয়ার কাছে রথীন যেন এক দূরের মানুষ। যত কথা বলুক ওরা দুজন—বেদনার গাঢ় রেখাটা রূঢ় চেষ্টায় মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করুক—খোকনের ভাবনা যাবে না—যেতে পারে না।

তবুও রথীনকে ঈর্ষা করে সুপ্রিয়া। মধুর করুণ এক ঈর্ষা!

কোন ভাবনা যেন নেই রথীনের। কারুর কাছে কোন দাসখৎ লেখা নেই। সে যখন খুশি আসবে—যখন খুশি যাবে। তার রোমকূপ দিয়ে একা-একাই উপভোগ করবে বেদনার পরিপূর্ণ রূপ।

তার বেদনার সঙ্গে কাঁটা-ফোটানো এক যন্ত্রণা মিশে থাকবে না সারাক্ষণ। সংসার করার অদ্ভুত এক গ্লানি তাকে তিল তিল করে পুড়িয়ে মারবে না।

হঠাৎ একসঙ্গে ওরা দুজনেই চমকে ওঠে। গেট খোলার শব্দ ভেসে আসে। খোকন আর বিমল ফিরে এসেছে। জোরে-জোরে কথা বলছে ওরা। দুজনেই ওদের গলার স্বর শুনতে পায়।

কিন্তু এ-ঘরের কাছাকাছি আসতেই যেন ওদের কথা ফুরিয়ে যায়। শুধু খটখট পায়ের শব্দ। স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে যে ওরা কেউই তাকায় না এদিকে। সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে উঠে যায়।

হয়তো সুপ্রিয়া ডাকতে পারত খোকন আর বিমলকে এ-ঘরে। রথীন আর একবার দেখতে পারত তার ছেলেকে। কিন্তু কি ভেবে সে ওদের কাউকেই ডাকে না—ডাকতে পারে না।

সেই অভ্যাস—সেই নিয়ম সুপ্রিয়াকে মূক করে রাখে।

রোজই রথীন আসবে। রোজই বিমল আর খোকন বেড়াতে যাবে। ফিরে আসবে। এরা দুজন বসে থাকবে। ওরা ওপরে উঠে যাবে। ঘরে আলো জ্বলবে।

হঠাৎ এক সময় রথীনের ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর বাজবে, আজ আমি যাই!

ভিজে দৃষ্টিতে সুপ্রিয়া তাকাবে তার দিকে। কোন কথা বলতে পারবে না। বলবার দরকারও হবে না। আস্তে আস্তে রথীন বেরিয়ে যাবে গেট খুলে। আর চলতে চলতে বারবার পিছন ফিরে ওপরে তাকাবে একবার খোকনকে দেখবার আশায়।

রথীন চলে যাবে কিন্তু সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ উঠবে না এ ঘর

থেকে। একাকীত্বের বিপুল স্বাদ অনুভব করবে মন দিয়ে। আর ভাববে তখন যদি সংস্কারের অভ্যাস আর অভিশাপকে সে আর পাঁচজনের মত মেনে নিতে পারত—শ্রদ্ধা করতে পারত, আর খোকন যদি না আসত এ পৃথিবীতে তাহলে আজ তার মনের অবস্থা কেমন হত!

কিম্বা রথীনের সঙ্গে তার যদি কোন যোগাযোগ না থাকত—সে যদি চাকরি নিয়ে অনেক দূরে চলে যেত কিম্বা হারিয়ে যেত কোথাও, আর রোজ সন্ধ্যায় এ ঘরের আলো না জ্বলত—

তাহলে? হয়তো বিমলের মুখটা অমন করুণ দেখাত না, খোকন তার মাকেও হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত বেড়াতে আর কখনও এ-ঘরে ছুটে এসে আর একটা মানুষকে দেখে কাঠের পুতুলের মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত না।

কিন্তু কেন দূরে চলে যাবে রথীন?

নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবে নিজের ওপরই ঘৃণা হয় সুপ্রিয়ার। শুধু সে একা খোকনকে দেখবে কেন? কেন বিমল অন্য আর এক অলৌকিক ক্ষমতায় পিতৃত্বের মাধুর্যে মুগ্ধ হবে?

মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে যাবে সুপ্রিয়ার। কাউকেই তার দরকার নেই। কোন অভ্যাসে কিম্বা নিয়মে তার মুক্তি নেই। সে রথীনের মত নয়। তার গোটা জীবনটাই যেন এক অভিশাপ!

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সুপ্রিয়া সুস্থ হয়ে ওঠে। বিমল নেমে আসে নিচে। খোকনও। হ্যাঁ, ওরা দুজনেই এখন বুঝি নিশ্চিন্ত। রথীন নেই।

বিমল বলে, একা-একা বসে আছ, খাবে না?

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চল।

বিমলের হাত ছেড়ে দিয়ে খোকন এসে মা-র হাত ধরে! অনর্গল

কথা বলে যায়। রাস্তায় আজ ঠিক তার মার মত সে আর এক-জনকে দেখেছে। তার নিজের কোন মাসি নেই কেন ?

বেড়াতে বুঝি তোমার ভাল লাগে না মা ?

লাগে।

তবে যাও না কেন একদিনও ?

তুমি তো আমাকে নিয়ে যাওনা খোকন !

কিন্তু কি ভেবে হাসি মিলিয়ে যায় খোকনের ঠোঁট থেকে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে একবার বিমলের দিকে তাকায়। তারপর খেয়ে যায় চুপচাপ। মা-র সঙ্গে আর একটাও কথা বলে না।

আর বিমলের সামনে সুপ্রিয়াও সহজভাবে আর কথা বলতে পারে না খোকনের সঙ্গে। যেন দুজনেই বুঝতে পারে কেন এই আকস্মিক নীরবতা।

যদিও এখন রথীন এখানে নেই তবুও যেন সে এসে দাঁড়ায় ওদের মাঝখানে। ভয়ঙ্কর এক প্রেতচ্ছায়ার মত। আবার মাথা দপ্‌দপ্‌ করে সুপ্রিয়ার। এদের দুজনের চোখের আড়ালে চলে যেতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়।

কিন্তু সারাদিন সংসারে অভ্যাসের চাকা ঘুরে যায়। আজ অভ্যাসের ফাঁকে-ফাঁকে মধুর একটা স্বাদ খুঁজে পায় সুপ্রিয়া। সকালবেলা বিমলও যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়।

এ কোটটা ধোপার বাড়ি দাওনি ?

আর একটা তো আছে। আজ সেটা পরে যাও না অফিসে—

পরশুদিন মীটিং—সেদিন ওটা পরে যাব ভেবেছিলাম—স্বরে কৃত্রিম উষ্ণা বিমলের।

একই গরম স্যুট পরে পরপর তিনদিন কি যাওয়া যায় না

অফিসে ? সুপ্রিয়ার স্বরেও ঝাঁজ ফুটে ওঠে।

বিমল হেসে বলে, দাও যেটা হয়। নিজে কিছু মনে রাখতে পারবে না শুধু চেঁচামেচি করে জিততে চাইবে—

হয়েছে, আরও জোরে বলে সুপ্রিয়া, তোমার মত স্মরণশক্তি প্রখর নয় আমার।

দূরে দাঁড়িয়ে খোকন হাসে। কিছু বুঝুক বা না-বুঝুক, এই অল্প বয়সে মা-বাবার কথাবার্তার মধ্যে সে-ও যেন উত্তাপের স্বাদ পায়। আর ছোট একটা বল নিয়ে ঢপ ঢপ শব্দ করে। যেন তাল দেয় মা-বাবার কথার সঙ্গে।

খোকনকে ধমক দিয়ে সুপ্রিয়া বলে, হাসছ যে ফাজিল ছেলে ?

একটুও ভয় পায় না খোকন। হাসতে-হাসতেই বলে, তোমার কিছু মনে থাকে না—

খুব হয়েছে। এবার চুপ কর। যেমন বাপ তেমন ছেলে—আমার দোষ ধরতে দুজনেই সমান।

বিমল অফিসে বেরিয়ে যায় আর খোকন তৈরি হয় ইস্কুলে যাবার জন্যে। আর যখন দুজনেই চলে যায় তখন প্রাণহীন একটা জীবের মত সুপ্রিয়া একা পড়ে থাকে ফাঁকা বাড়িতে। সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করে। রথীন আসবে।

মাঝে মাঝে সে যা-ই ভাবুক, একদিন রথীন না এলে সে ছটফট করে। যেন একটা সার্থক মিল কবিতার ছন্দপতন হয়েছে হঠাৎ।

কেন রথীনের জন্যে সুপ্রিয়ার এই ব্যাকুল প্রতীক্ষা !

হয়তো এটাও এখন একটা দৈনন্দিন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু সুখ, একটু দুঃখ আর বুক-জোড়া যন্ত্রণা—এ তিন নিয়েই যেন গোটা একটা জীবনের স্বাদ পায় সুপ্রিয়া।

না, সে সকলের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারে, কোন

আকর্ষণ তার নেই রথীনের জন্যে। বিমলের জন্যেও নেই। খোকনের জন্যে আছে কি না সে ঠিক বুঝতে পারে না।

হয়তো নেই। যদি ঠিক তার মতই আর একটা ছেলে থাকত এ বাড়িতে আর রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকত সুপ্রিয়ার তাহলে প্রতিদিনের অভ্যাসের পঁ্যাচে-পঁ্যাচে হয়তো সেই ছেলেটির সঙ্গে তারও একটা সম্পর্ক গড়ে উঠত। যেমন উঠেছে বিমলের সঙ্গে খোকনের।

না, আর কিছু নেই এ পৃথিবীতে। ঝিমঝিম একটা ভাবনা পেয়ে বসে সুপ্রিয়াকে—সবই অভ্যাস। আর এই অভ্যাস গড়ে তোলা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের ওপর। যদি রথীন পুরোপুরি মিশতে পারত বিমলের সঙ্গে আর এ সংসারেই একটা স্থান করে নিতে পারত সব দম্ভ আর নিয়মের বেড়া ডিঙিয়ে, তাহলে হয়তো তাকে দেখলেই খোকনের দেহটাও ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠত না।

কিন্তু এই অভ্যাসের হয়তো সহজ স্বাভাবিক একটা গতি আছে। নিয়ম আছে। ছন্দ আছে। সেখানে জোর করে কিছু ঢোকানো যায় না। এই অভ্যাসের ছন্দকে আজও সুপ্রিয়া জোর করে অস্বীকার করতে চায় বলেই আঘাত পায়।

বিমল কখনও আসে না তাদের মধ্যে। খোকন কখনও আন্তরিকতার উত্তাপে ঝাঁপিয়ে পড়ে না রথীনের কোলের ওপর। কিন্তু অভ্যাসের সেই ছন্দে যদি সুপ্রিয়া তাল মেলাতে পারত তাহলে হয়তো যন্ত্রণার দাহ তাকে এমন করে অস্থির করে তুলত না। অভ্যাস আর নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের মনের মত একটা জগৎ রচনা করতে চায় বলেই আজও সে জ্বলে মরে।

খোকনের যেদিন ইস্কুল বন্ধ থাকে কিম্বা তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যায় সেদিন সমস্ত জেনেও সুপ্রিয়া আবার তাকে অভ্যাসের জগৎ থেকে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে আর অনুভব করে তীব্র এক দংশন। তবু হার মানতে চায় না সে। তবু নিয়ম ভাঙতে চায়।

বল ঢপ ঢপ করতে করতে খোকন এগিয়ে আসে সুপ্রিয়ার কাছে, ও মা, বিস্কুট দেবে না আমাকে?

ওই তো টিনের মধ্যে আছে, নিজে একটু বের করে নাও না দুষ্টু ছেলে—

না, আমি খাব না।

সুপ্রিয়া হেসে জিজ্ঞেস করে, কেন?

তুমি আমাকে দুষ্টু বললে কেন? আরও জোরে বলটা ঢপ ঢপ করে খোকন।

আর বলব না, সুপ্রিয়া খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আর কি খাবে বল দেখি।

চকোলেট, খোকনের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। মা-র মুখ দেখে সে বুঝতে চায় তার কাছে চকোলেট আছে কি না।

কিন্তু স্থির চোখ সুপ্রিয়ার। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে নিজের ছেলের দিকে। কেমন করে কথা শুরু করবে মনে মনে তা বোধহয় ঝালিয়ে নেয়। এইটুকু একটা ছেলের কাছেও যেন সেকথা জানাতে সে লজ্জা পায়।

একটু ভারী স্বরে সুপ্রিয়া ডাকে, খোকন!

হঠাৎ সুপ্রিয়ার গম্ভীর হয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজে না পেয়ে খোকন এসে মার কোলে মুখ গুঁজে দাঁড়ায়।

তুমি আমাকে ভালবাস খোকন?

মাথা তুলে খোকন হাসে, হ্যাঁ।

আর তোমার বাবাকে ?

খোকন আবার বলে, হ্যাঁ।

শব্দ করে একটা লরী গেল রাস্তা দিয়ে। তারপরই আবার চুপচাপ। রোদ মিলিয়ে গেছে বাইরে। ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা ঝলক আছাড় খেয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে।

বুক কাঁপতে থাকে সুপ্রিয়ার। শীতে নয়, অদ্ভুত এক উত্তেজনায়। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে যেন খোকনকে বুকে চেপে ধরে। কিছুক্ষণ যেন কথা বলতেই ভরসা হয় না তার।

খোকন! খুব আস্তে সুপ্রিয়া ডাকে।

কি মা ?

আর রথীনকাকাকেও তুমি ভালবাস না ?

মা আর ছেলে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। করুণ মথমে দৃষ্টি। মা যেন বলছে, বল হ্যাঁ, আমি ভালবাসি রথীন-কাকাকে। আর ছেলে যেন মিনতি করছে, তুমি আমাকে বল না অমন একজন মানুষকে ভালবাসতে।

খোকনকে দেখতে দেখতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুপ্রিয়া কিন্তু ওকে অনুরোধ করতে পারে না। জোর করেও সে যা শুনতে চায় তা বলাতে পারে না।

আর খোকন আস্তে আস্তে সরে যায় সুপ্রিয়ার কাছ থেকে। ওর সব আবদার সব চঞ্চলতা কেটে যায়। যেন সে এ বাড়িতে এই মাত্র এল। আর সুপ্রিয়া তার কেউই নয়।

তখন সুপ্রিয়ার নিজেরও এ সংসারটা বড় অচেনা মনে হয়। তবুও এ প্রশ্ন খোকনকে সে করতে পেরেছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সজল দৃষ্টিতে তাকে নিঃশব্দে হয়তো বুঝিয়ে দিয়েছে যে রথীনকে ভালবাসতে পারলে তার মা খুশি হবে।

কিন্তু বিমলের বেলায়? দিনের বেলায় কথা-বার্তায় ব্যবহারে কত সজীব বিমল! কত মধুর। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় তার চেহারাটাই যেন বদলে যায়। অচেনা একটা মানুষ। মাথা তুলে রথীন কিম্বা সুপ্রিয়া কারুর দিকে তাকায় না।

যে প্রশ্ন খোকনকে করতে পেরেছে সুপ্রিয়া—অনেক চেষ্টা করেও সে কথা বলতে পারে না বিমলকে। তাকে বলতে পারেনা যে রথীন এলে মাঝে মাঝে তুমি এসে বসো আমাদের সঙ্গে—ছুটো কথা বলো যেন খোকন মনে করতে পারে, তুমিও আমাদেরই একজন আর সহজ হতে পারে রথীনের কাছে।

কিন্তু না। শুধু মুখের কথায় কিছু গড়ে ওঠে না। সুপ্রিয়ার সাধ্য কতখানি! কিছু বলতে পারে না সে বিমলকে। ওকে বিমর্ষ করে তুলতে পারে না। তাই নিজেই এক মূর্তিমতী অভিশাপের মত এ সংসারে ঘুরে বেড়ায়।

গড়ে উঠুক যা গড়ে ওঠবার। যা ভাঙবার তা চুরমার হয়ে যাক। সত্য মিথ্যা হোক। মিথ্যা হোক সত্য। আর একবার—মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে হলেও—সুপ্রিয়া জ্বলে উঠতে চায়। অভ্যাস আর নিয়মের এই পৃথিবীকে পুড়িয়ে ফেলে সত্যকেই স্বীকার করে নিতে চায়।

ভয় লজ্জা ছুর্নাম অপমান একে-একে খসে পড়ুক। সত্য আর স্বাধীনতার নিবিড় স্বাদে বন্য এক মুক্তি আকাশ থেকে নেমে এসে তাকে বাঁচিয়ে দিক। গোপনতার সব ছল ঘুচিয়ে দিক।

কিন্তু রথীন মাথা তুলতে চায় না কেন!

যন্ত্রণায় সুপ্রিয়া মাথা নামায়।

সুপ্রিয়ার চোখ ছুটো যেন নষ্ট হয়ে গেছে। আর মনের যে

আগ্রহ জীবনকে সার্থক কৌতূহলী করে তোলে তাও যেন আগুনের লিকলিক আঁচে পুড়ে পুড়ে একেবারে শুকিয়ে গেছে। কোথাও এক টুকরো সজীব ঘাসকে হাওয়ায় ফুলে উঠতে দেখে না সুপ্রিয়া। চারপাশে শুধু পাষাণের মতো কঠিন মাটি আর তার উত্তাপ এত বেশি যে পা ফেলতে গেলে চমকে উঠতে হয়।

এখন আকাশে স্থির ঘন মেঘ। গাছগুলো খুশিতে উচ্ছল। আর পাতার রঙ ঘন সবুজ। অনেক দূর থেকে আর এক গম্ভীর কঠিন ঋতু এগিয়ে আসছে—মাঝে মাঝে ভিজে বাতাসে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মাঝরাতে ম্লান জ্যোৎস্নার কাঁপা কাঁপা আভায় কর্কশ কান্নার মতো কাছাকাছি একটা কাক ডেকে ওঠে। আর হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় মশারি অল্প-অল্প কাঁপে। তখন আকণ্ঠ তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে যায় সুপ্রিয়ার।

আর অনেকক্ষণ চোখ বুঝতে পারে না সে। এই শেষ রাতের ভিজে প্রেতচ্ছায়া-জ্যোৎস্নায় কাক-কান্না ঠাণ্ডা অন্ধকারে সে মুছে যেতে চায় এ পৃথিবী থেকে—সব যন্ত্রণা থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি পেতে চায়।

একদিন সে তো এ জীবনকেই ভালবেসেছিল। আর কাউকে নয়। আর কিছুকে নয়। শুধু জীবন আর জীবনের দাবীকে। কিন্তু আজ ঘুম আর জাগরণের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার শিরায়-শিরায় কড়া ঝাঁজালো বিষ ঢেলে দেয়। তাই নিঃশব্দে সুপ্রিয়া শেষ হয়ে যেতে চায়।

কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগে একটা ভয়ঙ্কর একাকীত্বের মাঝে আত্মগোপন করে থাকতে চায়। এমন কোন জায়গায় যাবার ইচ্ছায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে—যেখানে কারুর

সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকবে না—একটি মানুষও কথা বলবে না তার সঙ্গে।

সেখানে গিয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যেও ব্যস্ত হয় না সুপ্রিয়া। সে শুধু ঘুমিয়ে থাকতে চায়—এমন ঘুম যা সহজে ভাঙবে না। কিন্তু আশ্চর্য, ঘুম নেই সুপ্রিয়ার চোখে। জাগরণের একটা বীভৎস অনুভূতি জ্বালা ধরিয়ে দেয় তার রক্তে। আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন সে ঘুমের জন্যে আকুল মিনতি জানায়।

আর তার চোখের সামনে নিস্তব্ধ রাতের সেই শেষ প্রহরে সীমাহীন এক ধূসর রুক্ষ মরুভূমি কাঁপতে থাকে। সাংঘাতিক উত্তাপ থেকে থেকে যেন দেহ ঝলসে দেয়। ধুলোর ঝড়ে চোখ জ্বলে। পিছনে প্রকৃতির বুক-জ্বলা হাহাকার আর সামনে মৃত্যুর মতো কঠিন থমথমে অন্ধকার। তবুও তারই মাঝে আন্দাজে-আন্দাজে পা ফেলে চলেছে সুপ্রিয়া।

আর নয়। এখানে থাকা অসম্ভব। এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে—পালাতেই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে সে? কোথায়? কোন উত্তর নেই।

পিছন ফিরে সুপ্রিয়া একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নেয়। কী নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমচ্ছে বিমল আর খোকন! যেন সুখের দুটো উজ্জ্বল টুকরো অলৌকিক আভায় জ্বলছে পাশাপাশি।

সুপ্রিয়া অন্ধকারে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। আর এখন একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ঝরে না তার। কান্না নেই, বেদনা নেই —যেন সিক্ত কিছু নেই এ পৃথিবীতে কোথাও।

খোকন, বিমল, রথীন আর তার ঘুম কেড়ে নেয়া রুক্ষ এই মরুভূমি বেঁধে রাখতে পারবে না সুপ্রিয়াকে। কারুর কথা মনে

করে এক মুহূর্তের জন্যেও সজল হবে না তার চোখ। একাকীত্বের নিবিড় শান্তি তাকে প্রাচীর ঘেরা অন্য এক পরিবেশে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে সুপ্রিয়ার। চোখ দুটো যেন স্থির হয়ে আসে। শরীর অবশ হয়ে আসছে। তুষারের ঝাপটার মতো ঠাণ্ডা স্পর্শ গায়ে লাগছে কোথা থেকে। আকাশটা অস্পষ্ট। তারাগুলো যেন সরে গেছে আরও অনেক ওপরে। আর ক্লান্ত একটা উট গ্রীবা তুলে কি দেখছে।

কিন্তু আর এক মিনিট। আর একটু বাকি আছে। তারপর সব শেষ হয়ে যাক। খোকন কাঁদুক। বিমল প্রাণহীন পাষাণ-মূর্তির মতো থাকুক যেমনকার তেমন। সন্ধ্যেবেলা রথীন এসে প্রবল এক আঘাত খেয়ে ফিরে যাক—

রথীনের কথাটা মনে হতেই সুপ্রিয়ার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যায়। রথীন রোজ সন্ধ্যার মতো আবার আসবে এ বাড়িতে। অভ্যাস মতো বসে পড়বে সেই এক চেয়ারে। আর চাকরটা একটাও কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকবে তার সামনে।

অনেকক্ষণ কেটে যাবে। সেই ঘরে শুধু রঘু আর রথীন। পায়ের শব্দে হয়তো হঠাৎ এক সময় মাথা তুলবে রথীন। না, সুপ্রিয়া নয়। বিমল আর খোকন হাত ধরাধরি করে বেড়াতে যাচ্ছে।

আর ঠিক তখন চমকে উঠবে রথীন। একটা করুণ নিশ্বাসের শব্দে মাথা তুলে তাকাবে রঘুর দিকে। উত্তেজনায় চেহারাটা অন্য রকম হয়ে যাবে এক মুহূর্তে। উঠে দাঁড়িয়ে রঘুর কাছে এগিয়ে আসবে রথীন।

রঘু—

কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ঝরঝর করে কেঁদে

ফেলবে রঘু। হ্যাঁ, সুপ্রিয়া জানে, এ বাড়ির মধ্যে শুধু ওই পুরণো চাকরটাই কাঁদবে তার জন্যে। খোকনও হয়তো কাঁদবে প্রথম-প্রথম কিন্তু তার মন থেকে সুপ্রিয়ার নাম মুছে যেতে খুব দেরি হবে না। বিমলের কাছ থেকে একদিন সব কথাই তো সে জানতে পারবে।

আবার রথীনের কথাই ভাবে সুপ্রিয়া। রঘুর কান্না থেকেই সে বুঝতে পারবে যে সুপ্রিয়া আর এখানে নেই। হঠাৎ হয়তো তার মৃত্যুর কথাটা রথীনের মাথায় আসবে না। ভাববে যে বিমলের সঙ্গে তাকে নিয়েই গোলমাল করে অন্য কোথাও চলে গেছে সুপ্রিয়া।

মনে মনে লজ্জা পেয়ে ঠাণ্ডা স্বরে রথীন জিজ্ঞাসা করবে রঘুকে, কবে গেল?

কাল ভোররাতে বাবু—

কোথায় গেছে জান?

তখন আরও জোরে কেঁদে উঠে রঘু এলোমেলো ভাষায় রথীনকে বুঝিয়ে দেবে যে সুপ্রিয়া আর ইহলোকে নেই। কথা শুনে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে রথীনের শরীর। পাণ্ডুর করুণ হবে মুখ। আর বোধহয় সুপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্যে সে নিজেকেই দায়ী করবে। আর এ বাড়িতে সে আর কোনদিনও আসতে পারবে না।

যদিও আজ সুপ্রিয়াকে দেখতে কিম্বা তার সঙ্গে কথা বলতে রথীন আসে না এখানে কিন্তু সুপ্রিয়া আছে বলেই তো সে আসতে পারে। আর কে তার সঙ্গে কথা বলবে—তাকে যত্ন করবে—তার মনের দাবীকেও শ্রদ্ধা জানাবে।

রথীনের পা দুটো কাঁপবে। হালকা হয়ে যাবে বুক। আর কোন প্রশ্ন করবে না সে রঘুকে। আস্তে আস্তে গেট খুলে যেন

একটা ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যাবে অন্ধকারে। খোকনকে দেখবার প্রবল।ইচ্ছে হলেও হয় তো ভবিষ্যতে এ বাড়িতে আর ঢুকতে পারবে না রথীন।

হঠাৎ রথীনকে সুপ্রিয়ার বড় অসহায় মনে হয়। তার করুণ অবস্থার কথা মনে করে কিছুক্ষণের জন্যে সে নিজের সব যন্ত্রণার কথা ভুলে যায়। না, কিছুতেই সে রথীনের অবস্থা আরও করুণ করে তুলতে পারে না। মরতে পারবে না সুপ্রিয়া।

তবুও তার যন্ত্রণা যত প্রবল হোক, বেদনা যত নিবিড় হোক, এখনও প্রত্যেকের সামনে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়ার বলবার সাহস আছে যে কোন অন্যায়ই সে করেনি। একটা সুন্দর ভান দিয়ে নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে না রেখে সে নিজেকেই শ্রদ্ধা করেছে। প্রশ্রয় দিয়েছে মনের দাবীকে।

কিন্তু এক-একা নির্জন হালকা অন্ধকারে প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া রাতের ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় আকাশের দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয়া আর একবার তলিয়ে যায় নিজের মনের গভীরে। আর দুই হাতে মাথা চেপে ধরে সে কী যেন ভাবে!

মনের দাবী! না, হাসতে ইচ্ছে করে না সুপ্রিয়ার। কিন্তু কথাটা মনে হতেই সে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সত্যিই কি শুধু মনের দাবীর তাগিদেই সে একদিন নিয়ম ভাঙার উৎকট জেদে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছিল? মাতৃত্বের মধুময় কল্পনা ছাড়া আর কিছুই কি ছিল না তার মনে?

হ্যাঁ, ছিল বই কি। সে কথা কাউকে বলতে না পারলেও নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে না সুপ্রিয়া। মাতৃত্বের কল্পনা করে নয়, একটা দুর্দম ক্ষুধায় সব নিয়ম কানুন লজ্জা বন্ধন চুরমার করতে চেয়েছিল সে।

যদি কোন ত্রুটি না থাকত বিমলের দিক থেকে আর খোকন এই পৃথিবীতে আসত অনেক আগে, হয়তো তাহলেও জীবনের সেই সময় দারুণ ক্ষুধায় বয়সের দম্ভ সাপের মতোই মুহূর্তে মুহূর্তে সুপ্রিয়াকে ছোবল মারত। আর রথীনের সঙ্গে তার যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠত সে কথা ঠিক।

কিন্তু একদিন—বয়সের দম্ভ আর ঝাঁজ নিভে গেলে সে সম্পর্কও হয় তো আপনিই চুকে যেত—মুছে যেত। কোন আগুন জ্বলত না সুপ্রিয়ার মনে। হঠাৎ খোকনকেই অসহ্য মনে হয় সুপ্রিয়ার। কেন সে এল এই পৃথিবীতে!

আবার সুপ্রিয়ার মাথার মধ্যে আগুনের শিখা দপ্‌দপ্‌ করে। ঠাণ্ডা রেলিঙ সে চেপে ধরে শক্ত করে। অনর্গল কথা শোনাতে চায় একজন নীরব শ্রোতাকে—সে তাকে কোন প্রশ্ন করবে না—শুধু সব কথা শুনে যাবে ক্ষমাসুন্দর চোখে।

একটু একটু করে তেমন একজন মানুষের কাছেই মুক্তির জন্যে সুপ্রিয়া এগিয়ে যাবে—প্রশ্রয় চাইবে শান্তির জন্যে। চারপাশে আগুন জ্বলুক—যে যেখানে আছে সেখানেই থাক—শুধু মনের তীব্র দাহ জুড়োতে সে সরে যাবে।

হাওয়ার একটা ঠাণ্ডা ঝলক তার কপালে দু-একটা চুল উড়িয়ে আনে। আর ঘাড়ের ওপর কার উষ্ণ নিশ্বাস একটা বিদ্যুৎ-চমক আনে। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে সুপ্রিয়া বিমলকে দেখে। নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে।

একটাও কথা বলে না বিমল। স্পর্শও করে না সুপ্রিয়াকে। আর তার চোখের দিকেও দেখে না সুপ্রিয়া। কিন্তু যেন কিসের নেশায় থরথর করে কাঁপতে থাকে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

কী যেন বলতে চায় বিমলকে। এক দৃষ্টিতে সুপ্রিয়া তাকিয়ে থাকে বিমলের মুখের দিকে।

না, দৃঢ়স্বরে সে বলে ওঠে, আমি কোনদিন কোন অন্যায় করি নি—

ঠাণ্ডা স্বরে বিমল বলে, শোবে চল।

তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর না ?

করি।

বিমলকে লক্ষ্য করে সুপ্রিয়া এগিয়ে আসে। আর পড়ে যাবার আগে দু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যায়। বিমলও শক্ত করে ধরে তাকে। খুব সাবধানে এক-পা এক-পা করে ঘরের মধ্যে আসে।

কষ্ট হচ্ছে ?

সুপ্রিয়া মৃদুস্বরে বলে, হ্যাঁ।

কি কষ্ট ?

জানি না—আমি বোঝাতে পারব না।

একটু ঘুমবার চেষ্টা কর।

আমার ঘুম হবে না।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিমল স্বরে দরদ ঢেলে বলে, হবে। এবার ঘুমোও।

আর কথা বলে না সুপ্রিয়া। কিন্তু তার এই দরদ দেখে মনে মনে জ্বলে যায়। যদিও জ্বলবার কোন মানে হয় না তবুও তার মনে হয় বিমল যেন তাকে বিদ্রূপ করছে।

হ্যাঁ, সুপ্রিয়ার প্রায়ই আজকাল মনে হয় যে বিমল তাকে লক্ষ্য করে—তাকে কৃপা করে আর তার করুণ অবস্থার কথা ভেবে তীব্র এক আনন্দের স্বাদও পায় মনে। তাই তাকে যখন ঘুমবার আশ্বাস দেয় বিমল তখন চোখ দুটো আরও বেশি কটকট করে।

একপাশ ফিরে বিছানায় চুপচাপ পড়ে থাকে সুপ্রিয়া। আর ভোরের প্রথম আলোয় আবার যখন কাক ডেকে ওঠে তখন দরকার না থাকলেও সে উঠে দাঁড়ায়। এঘর ওঘর ঘুরে ভাবে কখন চাকরটা উঠবে আর সংসারের কাজ নিয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে সে নিজেকে ভুলে থাকতে পারবে।

কিন্তু সময়ের গতি যেন বেশি মন্থর।

ঘরের মধ্যে বসে এক ভাবনা করতে করতে যখন দিশা হারিয়ে যায় সুপ্রিয়ার আর কোন কিছুতেই তার মন থাকে না তখন একটা অক্লান্ত যন্ত্রের মতো সে বেরিয়ে পড়ে। বাইরের চেনা-অচেনা অনেক মুখ—প্রকৃতির নানারূপ যদি তাকে সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু কোন ভাষা যেন নেই কারুর। শুধু তারই মতো অজস্র যন্ত্র ছুটোছুটি করছে চারপাশে। নিয়মের দ্রুতগতি চাকা কর্কশ শব্দ করে ঘুরে চলেছে। প্রাণের সন্ধান কোথাও পায় না সুপ্রিয়া।

শুধু নিয়ম আর অভ্যাস। যে তাল মেলাতে পারল সে রইল বেঁচে আর যে ছিটকে পড়ল তার দিন গেল জ্বলে. পুড়ে। তাই একটা ছিটকে পড়া গ্রহের মতোই মনের খেয়ালে সে ছুটে বেড়ায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। তারপর আবার যথাসময় বাড়ি ফিরে আসে। একদিন ইচ্ছে করেই একটু দেরীতে বাড়ি ফিরে আসে সুপ্রিয়া। না, রথীন আজ তার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। সে আসবে একটু দেরীতে।

যদিও সে দেরীতে ফিরে আসে কিন্তু অল্প অল্প অন্ধকার এখানে-ওখানে জমা হবার আগেই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিজের বাড়ি সাংঘাতিক আকর্ষণের উত্তেজনা জাগায় তার মনে।

যদি এর মধ্যেই এসে পড়ে রথীন আর বিমল আর খোকন

বেরিয়ে যায় তার সামনে দিয়ে—তাহলে একা-একা অনেক বেশি আহত হবে রথীন। শেষের দিকে তার ভাবনা ভেবেই সুপ্রিয়া ফিরে আসে।

কিন্তু তখন অন্ধকার ঘন হয়েছে। রাস্তা নির্জন। আর এখন লোক চলাচল নেই বললেই চলে। সুপ্রিয়া হঠাৎ ভেবে পায় না আজ কেন এত তাড়াতাড়ি সকলের বাইরের সব কাজ চুকে গেল।

কিন্তু ওপরে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। খোকন ছটফট করছে বিছানায়। একজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে। আর ব্যস্ত বিমল দাঁড়িয়ে আছে খোকনের মাথার কাছে।

কিন্তু বিস্মিত সুপ্রিয়া হঠাৎ তিন-পা পিছিয়ে আসে। আর একজন খোকন আর বিমলকে আড়াল করে ঘরের বাইরে বারান্দার একদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে রথীন।

সুপ্রিয়া ঘরে ঢোকে না। প্রথমে রথীনের কাছেই এগিয়ে আসে। কোন প্রশ্ন করে না। কিন্তু তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক কৌতূহলের আভায় জ্বলতে থাকে।

ফিস ফিস করে রথীন নিজেই কথা বলে তখন।

খোকনের অসুখ করেছে।

কি হয়েছে?

বিমলবাবুর সঙ্গে রোজকার মতো বেড়াতে বেরিয়েছিল, আরও আস্তে যেন ভয়ে-ভয়ে কথা বলে রথীন, জ্বর নিয়ে ফিরে আসে—

জ্বর? অবাক হয়ে সুপ্রিয়া বলে, কিন্তু সারাদিন তো ভালই ছিল—

হ্যাঁ। সন্ধ্যে থেকে—আমি আসবার পর—

রথীনের কথা শেষ হবার আগেই সুপ্রিয়া ভেতরে যায়।

খোকনের কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে। ডাক্তারের দিকে তাকায় ছলোছলো চোখে।

ডাক্তার হাসে। ভয়ের কিছু নেই। ঠাণ্ডা লেগে সামান্য জ্বর হয়েছে। এক দাগ ওষুধ পড়লেই কমে যাবে। তখন হাত তুলে ইসারায় রথীনকে ঘরের মধ্যে ডাকে সুপ্রিয়া।

কিন্তু রথীন আসে না। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে যেমনকার তেমন। এদিকে বিমল ঝুঁকে পড়ে খোকনের মুখের ওপর। তার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। আর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে খোকন চোখ বোজে।

রথীন দেখে দূরে দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয়া বারবার ডাকলেও ঘরের মধ্যে আসে না। অস্বস্তিতে বেশিক্ষণ খোকনের কাছে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না সুপ্রিয়া। আবার এসে রথীনের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

* এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

রথীন সুপ্রিয়ার কথার উত্তর না দিয়ে বলে, তুমি ভেতরে যাও। ওর কাছে থাক।

আর তুমি চোরের মতো এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?

আমি এখুনি চলে যাব।

না, জোর দিয়ে সুপ্রিয়া বলে, এস ভেতরে—

গিয়েছিলাম। বিমলবাবু আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রথীন বলে, কিন্তু—

কি?

আমি ওখানে থাকতে পারলাম না।

সব বুঝলেও সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করে, কেন? কে তোমাকে এখানে এসে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে?

কেউ না। আমি নিজেই—

রথীনের হাত ধরে তাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে সুপ্রিয়ার।

বিনা কারণে একটা সামান্য ব্যাপারকে কেন তুমি জটিল করে তোল?

করুণ হেসে রথীন বলে, তোমার মতো খোকনের কপালে আমিও একটা হাত রেখেছিলাম—

তারপর?

ও আমার হাতটা সরিয়ে দিল। আর বিমলবাবুর দিকে তাকিয়ে তখন—কথা শেষ না করে আস্তে আস্তে রথীন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু নড়তে পারে না সুপ্রিয়া। তাকে ডাকতেও পারে না। সেখানে দাঁড়িয়েই দেখে মাথা নিচু করে একটা ক্লান্ত করুণ মূর্তি বাইরের অন্ধকারে মিশে যায়।

॥ পাঁচ ॥

আর কয়েকদিন পর শীত চলে যাবে। এখন খুব সকালে যেমন এদিক-ওদিক পাতলা কুয়াশা জাল রচনা করে তেমন আমেজ থাকবে না কোথাও। বাতাসে ভেসে আসবে মিষ্টি একটা ঘ্রাণ। আর অনেক দূর থেকে ভেসে আসবে দীর্ঘশ্বাসের ভারী একটা শব্দ।

আবার এক বছর পরে শীত আসবে। শিশির ঝরবে গাছের মাথায়, পাতলা ঘাসে, কনকনানি ছড়িয়ে থাকবে চারপাশে।

খোকন আরও বড় হবে। আর যতই দিন যাবে, সে একটু একটু করে ততই সুপ্রিয়ার মুখের রেখায় একটা রহস্যের সন্ধান করবে। হয়তো কোন প্রশ্নই করবে না মাকে কিন্তু সুপ্রিয়ার মুখের করুণ গাম্ভীর্য যেন একটা ছায়া ফেলবে খোকনেরও কপালে।

তখন সুপ্রিয়ার সম্পর্কে তার ধারণাটা কেমন হবে!

কিন্তু সেকথা বেশিক্ষণ আর ভাবে না সুপ্রিয়া। হয়তো এই ভাবনার শেষ হবে শিগগির। রথীন হঠাৎ যেমন চলে গেছে সব ভাবনা-চিন্তার ঊর্ধ্বে—সে-ও চলে যাবে ঠিক তেমন করে।

মৃত্যু বড় মধুর মনে হয় সুপ্রিয়ার। প্রথম ফাল্গুনের বাতাসে সে আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলবার—সব ফেলে দূরে কোথাও চলে যাবার এক নিবিড় আনন্দের স্বাদ পায়।

এই পৃথিবীর কেউ আর কোনদিনও রথীনের দেখা পাবে না।

হয়তো কেউ দেখা পেতে চায়ও না। কিন্তু সুপ্রিয়া নিজে? রথীনের জন্যে কি আছে তার মনের গোপন সরোবরে?

আছে। একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস। মন্থর এক বেদনা। আর কিছু? একবার চারপাশে সুপ্রিয়া তাকিয়ে নেয়। কেউ কোথাও নেই। তখন সাহসের এক আকস্মিক দাহে সে উত্তর খুঁজে পায় মন হাতড়ে। নিবিড় মমত্ববোধ ছাড়া রথীনের জন্যে তার আর কিছু নেই।

কিন্তু কোনদিন কি ছিল?

প্রথম যেদিন রথীন তাকে দেখেছিল?

গ্রীষ্মের মায়াময় এক সন্ধ্যায় পুরু গদির সোফায় প্রায় আধ-ডোবা অবস্থায় সুপ্রিয়ার দামী রঙমাখা ঠোঁটে যখন অল্প-অল্প হাসি ফুটে উঠেছিল?

রক্তে সেদিন একটা নেশা ছিল সুপ্রিয়ার। ধারালো ছুরির মত বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে তার চোখ দুটো বুঝি টুকরো টুকরো করতে চেয়েছিল রথীনকে।

মনের সেই প্রবৃত্তির কি নাম দেয় মানুষ?

সিঁদুরের রেখাটা সেদিনও ছিল সুপ্রিয়ার সিঁথিতে। কিন্তু মোটে একবার চোরা-দৃষ্টি দিয়েই কাপুরুষের মত চোখ ফিরিয়ে নেয়নি রথীন। দেখেছিল। হেসেছিল। শোভন ইঙ্গিতের একটা তীরও বুঝি ছুঁড়েছিল সুপ্রিয়ার দিকে একটা কথা না বলে।

অনেক আলো জ্বলেছিল সেদিন সেই ঘরে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে অন্য কেউই ছিল না। রথীন প্রয়োজনেই এসেছিল সেই বাড়িতে। তার এক বন্ধুর বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে। আর যে পাত্রী তার সঙ্গে সুপ্রিয়ার পরিচয় অনেক দিনের।

যদিও এখন সুপ্রিয়ার কথা শুনে মাঝে মাঝে মৃদুলা অবাকই হয়ে যায়। আর হয়তো ঠিক বুঝতে পারে না যে ছেলেবেলার বন্ধু তার সঙ্গে রসিকতা করছে কিনা।

দেখ, এক ফাঁকে সুপ্রিয়ার কোন কথার সূত্র ধরে মৃদুলা তাকে বলে, সংসার করার যে অনেক জ্বালা সেকথা প্রায় সকলের মুখেই শুনি কিন্তু কোন মেয়ে বিয়ে করতে না চায় বল?

আমিও চেয়েছিলাম। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর—বিয়ে করে আমি ফুরিয়ে গেছি—শেষ হয়ে গেছি।

সংসার ছাড়তে পারিস?

এক কথায়।

বিমলবাবুর কথা তোর মনে হবে না?

দৃঢ়স্বরে সুপ্রিয়া বলে, না। আমি আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চাই।

হালকা সুরে মৃদুলা বলে, কর না।

করব বইকি, অন্যদিকে তাকিয়ে সুপ্রিয়া কথা বলে যায়, তোর বিয়ে হয়ে যাবে শিগগির। আর তুই নিশ্চয়ই সুখী হবি—

মৃদুলা হেসে বলে, তোর বুঝি সুখ নেই?

না। কৃত্রিম বন্ধনে কেউ সুখী হয় না—থাক, এসব কথা তোকে এ সময় আর শোনাব না। কিন্তু আমিও দেখিস, যেমন করে হোক, সুখী হবই। আর তোরা সকলে হয়তো সেকথা শুনে চমকে উঠবি। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবি কিনা কে জানে!

মৃদুলা হেসে বলে, থাম!

হয়তো মৃদুলার বিয়েটা হয়েছিল রথীন সুপ্রিয়াকে সেখানে দেখেছিল বলেই। এখন সেই বর-কনে কোথায়? কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তারা?

না, বিয়ের পর তাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি সুপ্রিয়ার। গুজরাটে বর চাকরি করত। হয়তো এখনও আছে সেখানেই। কিম্বা হয়তো রথীনের মত শেষ হয়ে গেছে—কে জানে?

আপনি বুঝি মেয়ের দিদি? সেই কবে সুপ্রিয়াকে প্রথম প্রশ্ন করেছিল রথীন।

হাসিমুখে সুপ্রিয়া উত্তর দিয়েছিল, না। বন্ধু।

কাছাকাছি থাকেন?

হ্যাঁ।

মাঝে মাঝে আসেন এ বাড়িতে?

হ্যাঁ, প্রায়ই আসি।

এবার সুপ্রিয়ার কিছু বলবার পালা। না হলে হয়তো চুপ করে থাকবে রথীন। ওপরে তাকিয়ে ঘন ঘন সিগ্রেট টানবে। আর হঠাৎ এক সময় মৃদুলার মা এসে পড়বেন ঘরে। তখন তাঁরই সঙ্গে কথা বলতে হবে রথীনকে।

কিন্তু কি কথা বলবে সুপ্রিয়া? কোন ভাষায় তাকে প্রথম দিনই বুঝিয়ে দেবে যে মাথায় বন্ধনের একটা সরু চিহ্ন আঁকা থাকলেও কোন বন্ধন নেই আমার। আমি বিপুল পরিধির মাঝে বিচরণ করতে চাই। তুমি সঙ্কোচ করো না—পিছিয়ে যেও না।

রথীনের চোখের দিকে তাকিয়ে অসঙ্কোচ প্রশ্ন করেছিল সুপ্রিয়া, আপনিও কি আপনার বন্ধুর মত কলকাতার বাইরে থাকেন?

না। আমি এখানেই থাকি।

কাছাকাছি?

খুব কাছাকাছি নয়, তবে এমন কিছু দূরেও নয়—

কথা চালিয়ে যাবার জন্যেই হয়তো অশোভন কৌতূহল প্রকাশ করেছিল সুপ্রিয়া, কত দূরে?

বিবেকানন্দ রোডে।

আমি ওদিকে কখনও যাইনি।

ইচ্ছে হলে নিশ্চয়ই যাবেন।

দরজার দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে চাপা স্বরে সুপ্রিয়া বলেছিল, আর যদি মৃতুলার সঙ্গে আপনার বন্ধুর বিয়ে না হয়?

যেন এক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিল রথীন। তারপর থেমে থেমে বলেছিল, হবেই। কিন্তু না হলেও আমার সঙ্গে আপনার দেখা হবার কোন বাধা আছে কি?

হঠাৎ আশ্চর্য দৃঢ়তার সবঙ্গ যেন সুপ্রিয়া বলে ফেলেছিল, না নেই।

কিন্তু কেন সেদিন সেকথা সে বলেছিল রথীনকে? মস্ত বড় একটা প্রশ্ন আজ অনেকদিন পর সুপ্রিয়ার মন তোলপাড় করে দেয়, কেন?

অভিশাপের একটা ভয়ঙ্কর গতি সে আমন্ত্রণ করে আনতে চেয়েছিল তার রক্তের মধ্যে। না, বিমল নেই তার জীবনে। সেই মানুষটার কোন প্রভাবও যেন নেই তার ভাবনা-চিন্তায় রক্তে-নিশ্বাসে।

অভিশাপ নয়, জীর্ণ মনের অন্ধকার এক সংস্কার। তাকে খান খান করে দেবে সুপ্রিয়া। অভিশাপকে সোনায় মুড়ে তার মধ্যে সে এক প্রাণের স্বপ্ন দেখবে। আর তাকে পরিপূর্ণ করে তুলবে—প্রাণের স্বপ্নে বিভোর করে তুলবে আজকের এই রথীন।

হ্যাঁ, প্রথম দিনই মনে হয়েছিল সুপ্রিয়ার যে রথীন পারবে। ভীরুর মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে না। তার ওপর অবিচারও করবে না—তাকে বুঝবে। তাকে বাঁচাবে।

মৃতুলার বিয়ের দিন অনেক আগে থেকেই এ বাড়িতে চলে

এসেছিল সুপ্রিয়া। বর আসবে সন্ধ্যেবেলা। আর বরযাত্রীদের সঙ্গে আসবে রথীন। কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি। তবু সুপ্রিয়া বারবার বাইরে তাকিয়েছিল।

শুভলগ্নের আর কত বাকি।

শুধু মৃদুলার জীবনে নয়, সুপ্রিয়ারও জীবনে আজ এক নতুন লগ্ন আসছে। নতুন কিন্তু ভয়ঙ্কর। কখনও কখনও তার বুক কাঁপে—ভয়ের একটা শিহর তাকে নিস্তেজ করে দেয়। আর এক-একবার সে ভাবে, সরে যাই।

কিন্তু আর এক সাংঘাতিক শক্তি তাকে যেন সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর সুপ্রিয়ার কানে ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর বাজে, যদি পিছিয়ে যাও তাহলে শুধু শুধু আর একজনকে আর ধিক্কার দিও না। মানিয়ে নাও নিজেকে তোমার ঠাণ্ডা সংসারে। আর পাঁচজনের মতো সব দাবী ভুলে মনে মনে নিজের বয়স বাড়িয়ে নাও।

মৃদুলাকে দেখে সুপ্রিয়া। তাকে সাজায়। এঘর থেকে ওঘরে যায় ক্ষিপ্র পায়ে। আর হঠাৎ এক সময় মৃদুলার কানের কাছে মুখ এনে গুণগুণ করে গান গায়।

মৃদুলা বলে, কি ?

খুশি রে খুশি।

গলার স্বর খুব নামিয়ে মৃদুলা বলে, আজ তোকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে !

হেসে সুপ্রিয়া বলে, তোর মুখ থেকে সেকথা শুনে আমার কি লাভ বল ?

বিমলবাবু কখন আসবেন ?

উনি আসবেন না।

কেন ?

আমি বারণ করেছি।

আর একবার মৃদুলা জিজ্ঞেস করে, কেন ?

আবার তার কানের কাছে মুখ এনে সুপ্রিয়া বলে, তুই আমাকে যেকথা শোনালি সেকথা আর একজনের মুখ থেকে শুনব বলে—

বিমলকে ইচ্ছে করেই সুপ্রিয়া সঙ্গে আনেনি। রথীন আর কাউকেই দেখবে না তার সঙ্গে। শুধু তাকেই দেখবে। তার সঙ্গেই কথা বলবে। না, এতে কোন অন্যায় নেই।

আজ—এই মুহূর্তে তার জীবনের গতি যদি হঠাৎ ঘুরে যায়—সে যদি সন্ধান পায় এক স্বাধীন উল্লাসের আর যদি তার মনের সায় থাকে তাহলে কেন সে শুধু শুধু নিজেকে ঠকাবে! আজ বিমল সুপ্রিয়ার জীবনে একটা ভারী পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়।

মৃদুলার বিয়ের লগ্ন ছিল শেষ রাত্রে। বৈশাখের প্রথম তবুও শীতের একটা অস্পষ্ট শিহরণ ছিল আকাশে। ঘন ঘন শাঁখ বাজছে। এদিকে কেউ নেই। ছাদের একপ্রান্ত নির্জন।

মৃদু প্রশ্ন করেছিল রথীন, খুব ক্লান্ত ?

একটুও না। আপনি ?

এখন কোন ক্লান্তি নেই, একটু চুপ করে থেকে হাসি-হাসি মুখে সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে রথীন বলেছিল, বিয়ে দেখবেন না ?

চমকে উঠেছিল সুপ্রিয়া, এখুনি যাব—

না।

আপনি দেখবেন না ?

না। বিয়ে হবেই। ওরাও সুখী হবে। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপের এমন সুযোগ হারালে আমার দুঃখ জীবনেও যাবে না।

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে সুপ্রিয়া বলেছিল, দেখা তো কতবারই হতে পারে—

কিন্তু এমন শেষ রাত্রে, এমন শঙ্খধ্বনির মাঝে, আর—ওপরে তাকিয়ে রথীন বলেছিল, আকাশটা একবার দেখুন—এমন পরিবেশে হয়তো দেখা হবার সুযোগ আমাদের জীবনে আর কখনও আসবে না—

কথা বলতে চায়নি সুপ্রিয়া কিন্তু তার মুখ থেকে যেন হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল, আসবে।

তবে আসুক—বার বার আসুক।

এবার ইচ্ছে করেই সুপ্রিয়া বলেছিল, আসবে।

এসেছিল বটে সুযোগ অনেকবার। ঠিক তেমন সুযোগ হয়তো নয় কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর—অনেক বেশি থরো থরো উদ্দাম।

আর একবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকায় সুপ্রিয়া।

না, খোকন কোথাও নেই।

তার জন্যে কী ছিল সেদিন রথীনের! আর সুপ্রিয়ারই বা কী ছিল রথীনের জন্যে! আবেগের বয়েস নেই। প্রেমেও অবিশ্বাস। বিবাহিত জীবনে শুধু ক্লান্তি। তবুও রথীন তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বারবার বলেছে, তুমি অসামান্য! তুমি অপরূপ!

হ্যাঁ, একদিন রথীন সত্যি তাকে নিয়ে গিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর উল্লাসের জগতে। যেখানে মিথ্যা সব নিয়ম-কানুন। মিথ্যা জীর্ণ সংস্কার সেখানে। মুক্ত মনের অক্লান্ত দাপাদাপি। রথীনের কাছ থেকে যতটুকু আশা করেছিল সুপ্রিয়া, পেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

রথীন বলেছিল, আসবে। খবর নেবে। খবর দেবে। কিন্তু অনেকদিন তার দেখা নেই। যদিও তাকে কোন ভয় নেই সুপ্রিয়ার আর কারুর কথা ভেবে কোন লজ্জাও নেই কিন্তু মনের ফাঁকে-ফাঁকে নারীত্বের স্বাভাবিক অহঙ্কার তাকে বাধা দিয়েছিল বিনা নিমন্ত্রণে রথীনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার।

কিন্তু কী প্রখর তেজ বৈশাখের! কী প্রচণ্ড দাহ! সুপ্রিয়ার শরীর পোড়ে। মনও। জ্বলবার আর জ্বালাবার এক ভয়ঙ্কর ইচ্ছায় সে যায় এঘর থেকে সে-ঘরে। তখন তার কাছে কোন অর্থই থাকে না এ সংসার আর জীবনের।

বিমল তার চোখের সামনে আসে যায়। ঠিক যেন একটা মৃতদেহ। কোন এক বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রভাবে চলাফেরা করছে। সুপ্রিয়ার রক্তে যে জোয়ার এসেছে তার খবর রাখবার ক্ষমতা নেই বলেই মুখ বুজে থাকে আজকাল।

কিন্তু রাতের অপরূপ ক্লান্তিতেও যখন ঘুম আসে না সুপ্রিয়ার তখন বিমলও জেগে থাকে। আর তাকে সেই আদিম কৌশলেই মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে সে তারই স্ত্রী। আর তখন দম বন্ধ করা কান্না ঠেলে ওঠে সুপ্রিয়ার গলায়।

আমাকে অনেকদিনের জন্যে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পার? অস্বাভাবিক স্বরে বিমলকে যেন সেই মধ্যরাতে মিনতি করে সুপ্রিয়া।

হয়তো হাওয়া বদলাবার জন্যে যেতে চায় সুপ্রিয়া—তার কথার এমন অর্থ করে বিমল তার আরও কাছে গড়িয়ে এসে বলে, বল কোথায় যেতে চাও?

বলব।

উৎসাহী হয়ে বিমল বলে ওঠে, আমারও আর কলকাতা ভাল লাগছে না—

সুপ্রিয়ার ভীত স্বর কেঁপে ওঠে, না না। তুমি না। আমি একা—একেবারে একা কোথাও চলে যেতে চাই—

পাশ ফিরে ক্লান্ত বিমল বলে, কেন ?

কিন্তু হয়তো প্রশ্ন করেই মনে মনে বিমল লজ্জা পায়। আবার সরে যায় দূরে। সুপ্রিয়ার উত্তরের অপেক্ষা করে না। সে উত্তর দেয়ও না। শুধু দুজনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। কিন্তু বোধহয় কারুর চোখেই ঘুম নেই।

অনেকক্ষণ পর দূর থেকেই যেন প্রচণ্ড এক রুদ্ধ আক্রোশ জয় করবার চেষ্টায় বিমল বলে ওঠে, আমাকে তুমি কি করতে বল ?

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে সুপ্রিয়ার। সেই অন্ধকারে যেন জ্বলতে জ্বলতে সে বলে, তুমি কিছু বুঝতে পার না ? দেখতে পার না যে আমি মরে যাচ্ছি ?

আর আমি ?

কিন্তু তোমার জন্যে আমি দায়ী নই। তুমি যা খুশি তাই কর—আমি তোমাকে বাধা দেব না। কিন্তু তুমি আমাকে আর অপমান কর না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে নিয়ে খেলা কর না—

কথায় ঝাঁজ মিশিয়ে বিমল জিজ্ঞেস করে, তুমি কি করতে চাও ?

তোমার সংসার ছেড়ে আমি চলে যেতে চাই।

ভারী স্বরে বিমল এবার বলে, যেও।

হ্যাঁ, যাবে বইকি সুপ্রিয়া—নিশ্চয়ই যাবে। এ যন্ত্রণার চেয়ে অপবাদ অনেক ভাল। সে ডুবে যাবে—হারিয়ে যাবে অপবাদের কঠিন অতলে।

এই জ্ঞান ভাল লাগে না সুপ্রিয়ার। শুধু নিয়ম আর নিয়ম। যে প্রবৃত্তি আদিম আর ভয়ঙ্কর তাকে কৌশলে খাঁচায় ভরে রাখলে

তার রূপ পালটে যায় বটে কিন্তু তা তখন তার গতিও হারিয়ে ফেলে। কত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অস্বাভাবিক করে তুলে নিজেকে ভুলিয়ে নিজেকেই ঠকিয়েছে মানুষ।

কিন্তু কোথায় রথীন!

ডোভার লেনের ফ্ল্যাটে রথীন এল এক পড়ন্ত বিকেলের রোদ-ছায়া দোলা রাস্তা পার হয়ে সুপ্রিয়ার বিনা নিমন্ত্রণেই। আর এল হয়তো তার বুকের নিজের যন্ত্রণার তাগিদে কিম্বা সুপ্রিয়ার বুক-জ্বালা হাহাকারের সন্ধান পেয়েই।

না, সুপ্রিয়া তাকে কখনও আসতে বলেনি এ বাড়িতে। বিমলের সংসার দেখাতে চায়নি। বন্ধনের এই কূপ দেখিয়ে অকারণ শঙ্কা জাগাতে চায়নি ঝড়ের মতো সব চুরমার করে এগিয়ে আসা রথীনের নির্মল মুক্ত সংস্কারহীন মনে। তাই রথীনকে এ বাড়িতে দেখে দিশাহারা হয়ে পড়ে সুপ্রিয়া। খুশিতে মনে মনে ভরে উঠলেও স্বাভাবিক স্বরে যেন কথা বলতে পারে না তার সঙ্গে। হৃদয়ের উপচে পড়া মাধুর্য দিয়ে অভ্যর্থনাও জানাতে পারে না।

দেখা না করে পারলাম না, রথীনের সহজ সরল গলার স্বর শোনে সুপ্রিয়া, তাই এলাম কোনরকম লৌকিকতা না করে—

বেশ করেছেন, কাঁপা-কাঁপা স্বরে সুপ্রিয়াকে বলতেই হয়, আমি জানতাম আপনি আসবেন।

রথীনকে ভেতরে নিয়ে আসে সুপ্রিয়া। তাকে এক মিনিট বসতে বলে নিজে তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ায় আয়নার সামনে। আর অনেকদিন পর আজ প্রথম মনে হয় প্রসাধনের যথেষ্ট সরঞ্জাম নেই বাড়িতে।

কিন্তু আয়নার সামনেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একা-একা

কী যেন ভাবে সুপ্রিয়া। মাথার উত্তাপ বাড়ছে। কপালে ঘাম জমেছে। শরীরটাও যেন কাঁপছে থর থর করে। রথীন একা বসে আছে সেকথাটা যেন ওর হঠাৎ খেয়াল থাকে না।

কেন ওকে এখানে দেখল রথীন। কেন ও এল এখানে। যদি আজ সে এ বেশে তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়! যদি ওঘরে একা-একা বসে নিজেকে প্রশ্ন করে, এই কি সেই!

আর বিমলকে দেখেই বা কি মনে হবে তার!

তবুও হাসে সুপ্রিয়া। তবু কথা বলে রথীনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুরেই। কপালের ঘাম কৌশলে মুছে ফেলে। পাখার গতি আরও অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর মনে হয় যে একজন আশ্চর্য জীবন্ত মানুষ বসে আছে তার চোখের সামনে।

বন্ধু চলে গেছে? সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ। আপাতত পাহাড়ে যাবে আপনার বন্ধুকে নিয়ে—কথা শেষ না করে হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে রথীন, আপনার বন্ধু এখন আমার বন্ধুর স্ত্রী—

হালকা সুরে সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করে, বাঃ, তা বলে হাসবেন কেন আপনি?

ওদের কথা ভেবে হাসছি না।

তাহলে?

নিজের কথা ভেবেই খুশি হয়ে উঠছি।

কেন?

বলতে পারেন, চেষ্টা করে ভাষাকে বোধহয় একটা অদ্ভুত রূপ দিতে চায় রথীন, পরিচয় যে এমন খুশির প্রচণ্ড ঝলক আনে তা আমি আগে জানতাম না।

কোন সঙ্কোচ না করে সুপ্রিয়াও বলে, আমিও না। তবে—

বলুন ?

পরিবেশে সব কিছুকে আরও সুন্দর করে তোলে।

যেমন ? কৌতূহলের ছটায় রথীনের চোখ দুটো অপরূপ হয়ে ওঠে।

সেখানে আর এখানে—এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুপ্রিয়া বলে, পরিবেশ একেবারে অন্যরকম নয় কি ?

হোক। কিন্তু মানুষতো সেই এক, একটু ইতস্তত করে রথীন বলে, আমার মন কিন্তু পরিবেশের অপেক্ষা রাখে না।

অকারণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে সুপ্রিয়া, কী জানি !

রথীন বলে, বোধহয় এখানে এসে অন্যায় করেছি।

সুপ্রিয়া চমকে ওঠে, কেন ?

পরিবেশের কথা কেন মনে হয় আপনার ?

মুখ নামিয়ে সুপ্রিয়া বলে, নিজের কথা ভেবে।

কি কথা ?

এই কূপে কি আমি করতে পারি ! আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়—আমার মাথা ঠুকে যায়।

কিন্তু মন মনই। আপনি যখন যেখানেই থাকুন, আপনার মনকে সব সময় ঘিরে থাকে এক পারাবার।

কেমন করে বুঝলেন ?

তা বলতে পারব না, যেন হঠাৎ হাসি মিলিয়ে যায় রথীনের মুখ থেকে, বুঝেছি বলেই তো এলাম, বাইরে তাকিয়ে রথীন বলে যায়, যাদের রোজ দেখি, তারা কেউই আপনার মতো নয়।

নিজের কথা কৌশলে শোনবার জন্যেই বোধহয় সুপ্রিয়া ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করে, তারা কেমন ?

তারা ? যেন সুপ্রিয়াকেই আবার প্রশ্ন করে রথীন, তারা

মরতে জানে কিন্তু বাঁচতে চায় না—বাঁচতে জানে না।

আর আমি ?

আপনি বাঁচতে পারেন।

কৃত্রিম একটা স্বর বার হয় সুপ্রিয়ার গলা চিরে, মারতেও পারি বোধহয়—আপনি সব কথা জানেন না।

আস্তে আস্তে জেনে নেব।

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে সুপ্রিয়া বলে, কি খাবেন বলুন ?

আজ কিছু নয়, নড়ে-চড়ে বসে রথীন, হ্যাঁ, আমি কিন্তু আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

কিসের ?

কোন কারণ নেই। বলতে পারেন পরিচয়ের আনন্দ প্রকাশের জন্যে। যাবেন একদিন ?

নিশ্চয়ই।

কবে ?

বলুন ?

কাল।

হ্যাঁ, কখন ?

আমি সব সময় বাড়িতে থাকব। যখন আপনার খুশি। আর—

কি বলুন ?

এ বাড়ির আর একজন মানুষের সঙ্গে যদিও আমার এখনও আলাপ হয়নি—তবুও তাঁকে—

না, মাথা নেড়ে সুপ্রিয়া বলে, আমি একাই যাব।

হাসিমুখে রথীন বলে, আপনার যা খুশি করবেন।

প্রথম দিন রথীনের সিঁড়ির ওপর একা-একা দাঁড়িয়ে পা দুটো

যেন অনেক ভারী হয়ে গিয়েছিল সুপ্রিয়ার। নিশ্বাস পড়ছিল জোরে-জোরে। একটা ভয় হিমের বাঁধনে বেঁধেছিল তাকে।

এ কোথায় এল সে! স্বল্প পরিচিত একটা মানুষ রথীন। তার আহ্বানে এমন করে সে সাড়া দিল। কী চোখে দেখে তাকে রথীন।

কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না। রথীন তাকে দেখতে পেয়েছে। দুপদুপ শব্দ করে নিচে নেমে আসছে দরজা খুলে দিতে। মনে মনে সুপ্রিয়া যেন মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেয়। যা হয় হোক।

তার বেঁচে থাকা মানেই মৃত্যু। তাই যদি অন্য আর এক মৃত্যু নতুন জীবনের দ্বার খুলে দেয়—দিক। সুপ্রিয়া মরে গেলেও বেঁচে উঠবে।

চারতলার সুন্দর ছোট একটা ফ্ল্যাট রথীনের। হু হু করে দক্ষিণের হাওয়া আসে। জামা কাপড় কাগজ আর ছোট ছোট জিনিস তছনছ করে দেয়। বিশৃঙ্খল। আগোছাল।

অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না সুপ্রিয়া। ওর সব ইচ্ছা যেন দপ্ করে নিভে যায়। কঠিন একটা ধিক্কার বুকের মধ্যে জ্বলে। না, আর কোনদিনও সে এখানে আসবে না। এখানে একা থাকে রথীন। আর কেউ কোথাও নেই। হয়তো কারুর আসবার সম্ভাবনাও নেই। তাই বিবর্ণ মুখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সুপ্রিয়া। কি কথা বলবে ঠিক করতে পারে না।

রথীন বলে, কি ভাবছেন?

মুখ তুলে সুপ্রিয়া বলে, আর কেউ নেই বুঝি আপনার সংসারে?

রথীন হেসে বলে, কেউ না। সংসার বলে কিছু নেই আমার।

সুপ্রিয়ার শরীর কাঠের মতো কঠিন হয়ে যায়। তৃষ্ণায় গলাও

যেন শুকিয়ে যায় কিন্তু রথীনের কাছে এক গ্লাস জল চাইবার সাহস হয় না তার। রথীন বোধহয় এক আশ্চর্য কৌশলে সুপ্রিয়ার মনের কথা বুঝতে পারে। ইচ্ছে করেই ঘরের একটা বন্ধ জানলা খুলে দেয়। আর নিজে একটু দূরে সরে বসে।

হাসিমুখেই কথা বলে রথীন, আপনি বোধহয় খুব ক্লান্ত ?

না না—

এরপর আবার যেদিন আসবেন, যেন সুপ্রিয়াকে খোঁচা দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই রথীন বলে, আর একজনকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন, তাহলে হয়তো আপনি এত ক্লান্ত হবেন না—

খোঁচা খেয়ে এক মুহূর্তে চেহারাটা অন্য রকম হয়ে যায় সুপ্রিয়ার। ভয় কেটে যায়। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে যেন সে সোজা হয়ে বসে।

কার কথা বলছেন ?

সহজ স্বরেই রথীন বলে, আপনার স্বামীর।

রূঢ় স্বরে সুপ্রিয়া বলে, কবে তাকে সঙ্গে করে এনেছি বলতে পারেন ?

না, আনেননি, একটু চুপ করে থেকে রথীন বলে, কিন্তু আনলে হয়তো আপনি এখানে সহজ হয়ে উঠতে পারতেন—

মৃদুস্বরে সুপ্রিয়া বলে, বলা যায় না।

আর কি কথা রথীনের সঙ্গে সুপ্রিয়ার সেদিন হয়েছিল আজ ভাল মনে পড়ে না। কিন্তু সে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিল ভয়ে-ভয়ে— সাবধানে চারপাশে তাকাতে তাকাতে। যেন ভয়ের বাঁধন কিছুতেই সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

আর বাড়ি ফিরে গালে একটা হাত ঠেকিয়ে একা-একা অন্ধকার ঘরে বসেছিল অনেকক্ষণ। একটা প্রশ্ন যেন তার বুক

চিরে-চিরে দিচ্ছে—হ্যাঁ কি না? এগিয়ে যাবে না পিছিয়ে আসবে? তার চোখ বেয়ে বোধহয় দু-এক ফোঁটা জলও ঝরে পড়েছিল।

বিমলের কাছ থেকে সুপ্রিয়া সেদিন কী একটা যেন আশা করেছিল! কিন্তু মূক বিমল। নির্বিকার। প্রশ্রয় দেয়নি। বাধাও না। যেন কোন কর্তব্য তার নেই সুপ্রিয়ার ওপর। কোন সম্পর্কও নেই।

কিন্তু সুপ্রিয়া তো সব কথাই বলেছিল বিমলকে সেদিন। আর তার কথা শোনবার জন্যে নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু কী নিষ্ঠুর বিমল!

আমাদের বাড়িতে সেদিন যিনি এসেছিলেন, সুপ্রিয়া বলেছিল বিমলকে, তুমি তাঁকে দেখেছ?

কে?

রথীনবাবু?

না।

মৃদুলার বিয়েতে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল—

কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি বিমল। খবরের কাগজটা নিজের মুখের সামনে মেলে ধরেছিল। যেন সুপ্রিয়ার কোন কথাই তার শোনবার দরকার নেই।

তবু সুপ্রিয়া বলেছিল, আমি কাল রথীনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম—

কাগজটা মুখের সামনে থেকে তখনও সরায় নি বিমল। বোধহয় ইচ্ছে করেই শোনেনি তার কথা। যেন সে সত্যি চলে গেছে এ সংসার থেকে।

কিন্তু ইচ্ছে করলে বিমল সেদিন অন্য আর এক আলো হয়তো

জ্বালাতে পারত সুপ্রিয়ার মনে। কেন তাকে দূরে সরিয়ে রাখল বিমল।

গভীর রাতে একা-একা বিছানার ওপর উঠে বসেছে সে। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ। চোখ বেয়ে জল পড়েছে তার।

না, দরকার নেই তার কোন ক্ষুধা মেটাবার। সে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। দাঁত নেই। চোখ নেই। ঠাণ্ডা দেহের রক্ত। সাদা চুল। কোথায় যাবে সে! কার কাছে যাবে!

সে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে নিজেকে বিমলের মতো। কিন্তু আশ্চর্য, বিমল কান্না শুনতে পায়নি তার। তাকে কাছে ডাকেনি। যেন ভয়ঙ্কর এক নীরবতায় ইচ্ছে করেই পৌরুষের মেকী দম্ভে অন্ধ হয়ে তাকে ঠেলে দিয়েছে জ্বলন্ত মৃত্যুর মধ্যে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভুল ভেঙে যায় সুপ্রিয়ার। মৃত্যুর নয়, জীবনেরই প্রতীক রথীন। সুপ্রিয়ার জীবনের চাকাটাই সে ঘুরিয়ে দেয়।

কেন বুক কনকন করে উঠেছিল—কেন পা ভারী হয়ে উঠেছিল সুপ্রিয়ার প্রথম দিন। যদি সে ফিরে যেত তাহলে পূর্ণতার এই আশ্চর্য স্বাদ কেমন করে পেত! এক-একটি মুহূর্ত যেন কাঁচা সোনার এক-একটি টুকরো। নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন বেঁচে থাকার দুর্লভ আগ্রহ। স্পর্শ যেন নব জীবনের সঙ্কেত। গোটা জীবনটাই যেন এসে গিয়েছিল সুপ্রিয়ার আয়ত্তে সেদিন।

ভয় নেই। লজ্জা নেই। সঙ্কোচ নেই। শুধু আদিম উল্লাসের কটু ঝাঁজ। একটা দাহ। একটা দম্ভ। আর আশ্চর্য বন্য সমর্পণ।

এই মৃত পৃথিবীতে যেন শুধু ওরা দুজনই বেঁচে আছে।

॥ ছয় ॥

অল্প-অল্প করে যেন আলো নিভে যাচ্ছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সংসারের কোন কাজ করেনি তবু ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। দু চোখ ফেটে বুঝি জল পড়বে। পাথরের মূর্তির মত দোতলার বারান্দায় বসে থাকে সুপ্রিয়া।

কয়েক দিনের জ্বরে শেষ হয়ে গেছে রথীন। মৃত্যুর সময় সুপ্রিয়া ছাড়া আর কেউ ছিল না তার কাছে। শেষ নিশ্বাস পড়বার পর-পর তার ভাই আর ভাই-এর বউ এসে হাজির হয়।

রোজ একবার নিয়ম করে তার কাছে গেছে সুপ্রিয়া। ডাক্তারকে খবর দিয়েছে। বিচলিত হবার কিছু ছিল না। সাংঘাতিক কিছু নয়। সে ভেবেছিল দু চার দিনের মধ্যেই হয়তো সেরে উঠবে রথীন। আবার রোজ সন্ধ্যায় আসবে খোকনকে দেখতে।

ওকে একবার দেখবে? ইচ্ছে করেই খোকনের নাম উচ্চারণ করেনি সুপ্রিয়া।

কোন রকমে যেন দেহটাকে এপাশে ফিরিয়েছিল রথীন, ও আসবে না।

আমি ওকে জোর করে নিয়ে আসব।

একরাশ হতাশা যেন ঝরে পড়েছিল রথীনের ছোট্ট উত্তরে, না।

কিন্তু কেন? কেন তুমি এমন করছ?

জোর ফলিয়ে কোন লাভ নেই, সুপ্রিয়া, হাঁপাতে হাঁপাতে রথীন বলেছিল, আমাকে দেখলে ওর হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে যাবে। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে ও অধীর হয়ে উঠবে। ওকে অমন কষ্ট দিলে আমি যে শান্তিতে মরতে পারব না—

বাধা দিয়ে সুপ্রিয়া আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল, রথীন!

আমাকে সুখী করবার জন্যে ওকে তুমি কষ্ট দিও না। ও নিজের মনে থাক। যা খুশি তা করুক। তাতেই আমার সুখ।

আর আমি? ধরা গলায় সুপ্রিয়া বলেছিল, সকলকে দুঃখ দিয়ে বিপুল এক দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে কেন আমি বেঁচে থাকব?

কোন দুঃখ তোমার নেই।

আছে—আছে। তুমি কিছু বোঝ না কেন?

যা আছে তা দুঃখ নয়। তুমি দেখতে জান না বলেই দুঃখ পাও।

আমায় শিখিয়ে দিতে পার কেমন করে দেখতে হয়?

রথীন হালকা হেসে বলেছিল, বিমলকে দেখে শিখে নাও। তাহলে তোমার আর কোন কষ্ট থাকবে না। আমার জন্যে নয়, বিমলের জন্যেও নয়—

আমি দেখতে জানি না—আমি কারুর দেখে শিখে নিতে পারব না—

পারবে, থেমে থেমে রথীন বলেছিল, আমি যখন থাকব না তখন তোমার আর একটা চোখ খুলে যাবে সুপ্রিয়া—

একথা কেন বলছ?

ম্লান হাসির একটা শীর্ণ রেখা ফুটে উঠেছিল রথীনের মুখে, তুমি দেখে নিও।

না না, আমি আর কিছু দেখতে চাই না—দেখতে পারব না।

তুমি এসব কথা বল না—

আমি আছি বলেই তোমার দৃষ্টি এক জায়গায় যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে আছে—

না, নেই রথীন।

হঠাৎ রথীন তার হাত ধরে যেন শেষ কথা শুনিয়েছিল তাকে, বিশ্বাস কর সুপ্রিয়া, তুমি থাকবে বলেই আমার সব দুঃখ মুছে গেছে—

মৃত্যুর আগে তাকে কী বলতে চেয়েছিল রথীন। তা স্পষ্ট ভাবে বোঝেনি সুপ্রিয়া। তবে শুধু একটি কথা বুঝেছে যে তার মত দুঃখ আর কেউই পায় নি। খোকন বিমল রথীন—কেউই নয়। আর রথীন চলে যাবার পর তার বেদনা আরও ভারী—আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

রথীন নেই। এ বাড়িতে সে আর আসবে না। নিচের সাজানো ঘরে নিয়ম করে আর রোজ সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। বেড়াতে যাবার সময় বিমল আর খোকন যদি আজও হঠাৎ ওদিকে তাকায় তাহলে ওরা দেখবে সে ঘর অন্ধকার।

সুপ্রিয়া ও ঘরে আর কতদিন যেতে পারবে না কে জানে! তীব্র নির্মম এক দংশনে একা-একা বসে সুপ্রিয়া ছটফট করে।

এতদিন তবু একজন ছিল। তার কাছে কিছুই গোপন ছিল না সুপ্রিয়ার। মনের অর্গল খুলে ঠাণ্ডা জলপ্রপাতের মত বেরিয়ে আসত কথার স্রোত। এখন শুকিয়ে গেছে সে-উৎস! এখন তার মনের জলপ্রপাতে স্নান করবার জন্যে আর একটি মানুষও নেই এ পৃথিবীতে।

আর কী তীব্র বেদনার এক অনুভূতিতে তুষার-মোড়া গাছের মত নিঝুম সুপ্রিয়া। পুঞ্জ পুঞ্জ কান্নার মেঘ জমে উঠছে মনে কিন্তু

সে-বেদনার ভাগ দেয়া চলবে না কাউকে। তার দুঃখে সমবেদনা জানাবে না কেউ।

রথীন নেই—এ কথা শুনে অশ্রু ঝরবে না খোকনের চোখে। শূন্য হয়ে যাবে না বিমলের বুক। তারা কেউই কোনদিন তো তাকে আমন্ত্রণ জানায় নি এ বাড়িতে আসবার জন্যে। সে এ পৃথিবীতে থাক না থাক, তাতে কার কি এসে যায় এ বাড়ির।

তাই দুঃখ বহনের ভারে নিঃশব্দে সুপ্রিয়া একা-একাই ভেঙে পড়ে। একটা পরিচিত মানুষের মৃত্যু-সংবাদও দিতে ইতস্তত করে বিমল কিম্বা খোকনকে। লজ্জায় সঙ্কোচে গুম হয়ে বসে থাকে চুপচাপ।

প্রথম ফাল্গুনের শীত-শীত ভাব ধোঁয়ার একটা আবরণ বিছিয়ে দেয় আকাশের কাছাকাছি। একসঙ্গে অনেক পাখি ডাকে। কিন্তু কী একটা সুর যেন বাজে না। একটা সাংঘাতিক ব্যতিক্রম যেন অন্ধকার করে দেয় সুপ্রিয়ার অভ্যাসের জগৎ।

নেই—নেই। তাল নেই। কিন্তু এ বিরাট ছন্দপতনে শুধু সুপ্রিয়া একা কেন দিশাহারা হয়ে পড়বে! যদি অভ্যাস আর অমোঘ নিয়মেই গড়া হয় এ জগৎ তাহলে সে-জগৎ শুধু কি তার একার জন্যে!

আর কেউ কি নেই সেখানে!

কিন্তু একটা গতি, একটা নিয়ম, ছন্দ আর অভ্যাস হয়তো সত্যি আছে। ঠিক বোঝা যায় না কিসের প্রভাবে একই মানুষ হঠাৎ কেমন করে অন্য রকম হয়ে যায়।

বিমল আর খোকন, কেন এরা ম্লান মুখে এক সময় এসে

দাঁড়ায় সুপ্রিয়ার সামনে। কেন কেঁপে ওঠে তাদের গলার স্বর আর সজল প্রশ্নে ওঠে নামে ঠোঁট!

আলো জ্বলে না আর নিচের ঘরে। কোন কণ্ঠস্বর বাজে না। খোকনই থমকে দাঁড়ায় প্রথমে। বাবার হাত ধরে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বার বার পিছন ফিরে তাকায়।

হয়তো বিমল জিজ্ঞেস করে, কি দেখছ খোকন?

কিন্তু পিছনে তাকিয়ে সে-ও বোধহয় মূক হয়ে যায়। আলো নেই। কথা নেই। নিচের ঘর অন্ধকার। শ্লথ গতিতে খোকন এগিয়ে যায় সামনে কিন্তু কাদের যেন খোঁজে বিমল বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে। সুপ্রিয়াকে দেখতে পায় না কিন্তু বারান্দার ফাঁক দিয়ে সে ওদের দুজনকে দেখে রোজই।

আর আরও দেখে সুপ্রিয়া যখন ওরা ফিরে আসে হাত ধরাধরি করে তখন আবছা অন্ধকারে আর রাস্তার আলোর পাতলা রেখায় করুণ গম্ভীর হয়ে ওঠে ওদের মুখ। দৃষ্টি সেই ঘরের দিকেই। সেখানে আজ আলো নেই, কথা নেই—শুধু থমথমে নিঝুম অন্ধকার।

কিন্তু সে ঘরই আজ বিমল আর খোকনকে কাছে টানে। বিপুল অন্ধকারে আলোর শানিত তীরের মত ফিসফিস করে কৌতূহলের স্রোত বইয়ে দেয় বাপ-ছেলের নির্বিকার মনে।

খুব আস্তে আস্তে বিমল আর খোকন গেট খুলে ভেতরে ঢোকে। থেমে থেমে এগিয়ে আসে। খোকন সেই ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলে বিমলকে।

কি? অন্ধকারে একা-একা দোতলার বারান্দায় বসে সুপ্রিয়া ওর কথা শুনতে পায় না! কিন্তু ওর মনকে মোচড় দিয়ে একটি প্রশ্নই ঠেলে ওঠে, কি জিজ্ঞেস করল খোকন ওই ঘরের দিকে

আঙুল দেখিয়ে।

বাবা, রথীনকাকা আজ আসেন নি কেন?

কালও তো আসেন নি খোকন—পরশুও না।

কি হয়েছে রথীনকাকার?

জানি না খোকন। মাকে জিজ্ঞেস কর—

কল্পনা করতে করতে সুপ্রিয়া হঠাৎ চমকে ওঠে। তখন কি উত্তর দেবে খোকনকে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুপ্রিয়া। নিচু রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে ওদের দেখে। ওরা কথা বলে। এগিয়ে আসে। সেই ঘরের কাছে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কেউ কোন কথা বলে না।

আর ওপর থেকে বুক তোলপাড় করা আগ্রহ নিয়ে সুপ্রিয়া দেখে ওদের অপরিমেয় দুঃখের মাঝে নিগূঢ় আনন্দের লোকাতীত এক অনুভূতি। এর সংজ্ঞার্থ জানা নেই সুপ্রিয়ার।

আকাশের কাছাকাছি ধোঁয়া কাঁপছে। গাছের পাতারা স্থির। অন্ধকার দানা বাঁধলেও আকাশের চিকন আলো তা ঘন হতে দিচ্ছে না। হঠাৎ হাওয়ার ঝলক যেন সুপ্রিয়ায় চৈতন্যকে বিপুল একটা নাড়া দিয়ে যায়।

বিমলের হাত ছেড়ে দেয় খোকন। দ্রুত পা ফেলে ঘরের দিকে এগিয়ে আসে। হয়তো কি ভেবে একমুহূর্তের জন্যে আঙুলগুলো কেঁপে ওঠে তার।

কিন্তু তবু সে পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে ঘরের মধ্যে। তারপর ম্লানমুখে আবার ফিরে আসে বিমলের কাছে। আর এবার বোধহয় আরও শক্ত করে তার হাত ধরে।

কিন্তু বিমল কি কথা জিজ্ঞেস করে তাকে তখন?

কি খোকন? কি হল?

কেউ নেই বাবা ওখানে। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার—ভিজে ভিজে খোকনের গলার স্বর।

খোকন?

বাবা?

মা-র কাছে যাবে?

যাব।

চল, আমরা তোমার মার কাছে যাই—

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি সুপ্রিয়া এসে বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ে। ওরা এখুনি এখানে এসে পড়বে। ইচ্ছে করেই সে আলো জ্বালায় না। ওরা কেউ যেন তার মুখ দেখতে না পায়।

পা টিপে-টিপে খোকন এসে দাঁড়ায় সুপ্রিয়ার সামনে। পিছনে পিছনে বিমল। দুজনের মুখেই ফুটে উঠেছে বিষাদের করুণ রেখা। সেই কাঁপা-কাঁপা অন্ধকারেও দেখতে পায় সুপ্রিয়া।

মা—

টেবিলের ওপর হাত রেখে সুপ্রিয়া ঝুঁকে পড়ে। ফোঁপায়। এতদিন পর এদের সামনে বোধহয় সে চিৎকার করে কাঁদতে পারবে। এখন তার আর কোন দ্বিধা নেই। সে জানে, কী কথা তাকে জিজ্ঞেস করবে খোকন। কী প্রশ্ন বুকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমল।

সুপ্রিয়া—এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে বিমল। আল-গোছে একটা হাত তার মাথায় রেখে যেন মনের সব দরদ উজাড় করে দেয় গলার স্বরে, রথীনবাবুর কি অসুখ করেছে?

আরও জোরে সুপ্রিয়া কাঁদে। বিমলের হাত শক্ত করে চেপে

ধরে। হাতড়ে-হাতড়ে খোকনকে খোঁজে।

রথীনকাকা কেন আসেন না মা ?

মাথা তোলে সুপ্রিয়া। একবার ছেলেকে দেখে। একবার স্বামীকে। তারপর আবার কাঁদে।

কিন্তু কান্না থামিয়ে কাউকেই বলতে পারে না যে রথীন তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

সুপ্রিয়া কিছু না বললেও বোধহয় সব কথা বুঝতে পারে বিমল। সে হাত তুলে নেয় না সুপ্রিয়ার মাথা থেকে কিন্তু কিছুক্ষণ হাত চলে না তার।

কি হয়েছিল রথীনবাবুর ? স্বর কাঁপে বিমলের।

কিন্তু সুপ্রিয়া তাকায় না কারুর দিকে। তার চোখের জলে টেবিল ভিজে যায়। ইচ্ছে করেই সে বিমলের কথার জবাব দেয় না। প্রশ্নটা যেন একেবারেই অস্বাভাবিক তার পক্ষে। সেই এক কথাই আবার শুনতে চায় সুপ্রিয়া।

কন আমাকে কিছু বলনি ? অপরাধীর মতো বিমল বলে।

এবার রুদ্ধস্বরে সুপ্রিয়া উত্তর দেয়, তোমরা কেউই তো তার কথা একদিনও আমাকে জিজ্ঞেস করনি-—একটা লোক যে আসে যায়—তার দিকে ফিরেও দেখনি তোমরা কেউ—

খোকন হঠাৎ বলে ওঠে, মা, কেঁদ না। রথীন কাকাকে তুমি আবার আসতে বল—আমি রোজ চকোলেট নেব তাঁর কাছ থেকে—

না না খোকন, সে আর আসবে না—সে আর নেই!

সুপ্রিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে খোকন চিৎকার করে শুধু ডেকে ওঠে, মা!

বিমল চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কথাও যেন এই

মুহূর্তে তার বলবার নেই। কিন্তু তার শরীরটা কাঁপে থরথর করে আর জলের আচ্ছন্ন বেগে চোখ দুটোও বোধহয় চিকচিক করে ওঠে। হ্যাঁ, সেকথা বুঝতে পারে সুপ্রিয়া।

কিন্তু সে কান্না থামাতে পারে না। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলতেও ইচ্ছে করে না এই মুহূর্তে। শুধু এ বাড়ির আর দুটি মানুষ তার শোকের ভাগ নিতে এগিয়ে আসে বলেই সে মনে মনে বোধ হয় এই কাঁপা-কাঁপা কান্নার একটা সার্থকতা খুঁজে পায়।

কোলের ওপর খোকন। পাশেই বিমল। আর থেমে থেমে হাওয়ার ঝলক। মাথা তুলে কাউকেই দেখে না সুপ্রিয়া তবু তার মনে হয়, না থেকেই রথীন যেন এক অলৌকিক নিয়মে বিমল খোকন আর তার সঙ্গে একেবারে এক হয়ে গেছে।